শুকতারা

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ বর্ষ • দশম সংখ্যা • অগ্রহায়ণ ১৩৯৭

পরবর্তী অংশ ভিতরে...

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল
স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

নতুন সিলেবাস অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আমাদের প্রকাশিত নতুন বই

● শিশুশ্রেণী ●

এসো পড়ি আঁক শিখি–শ্যামাপদ দত্ত
ছড়ার মেলা (১ম) (রঙিন)– ঐ
লেখা শেখ (১ম) ঐ – ঐ
ছবিতে অঙ্ক শেখ
(১ম)–ঐ মধুসূদন দেব
গুণতে মজা (রঙিন)–মধুসূদন মজুমদার

● প্রথম শ্রেণী ●

ছড়ার মেলা (১ম)– শ্যামাপদ দত্ত
লেখা শেখা (২য়) – ঐ
ছবিতে অঙ্ক শেখ (১ম)–মধুসূদন দেব
ছোটদের চিড়িয়াখানা–রবিদাস সাহারায়
মূল্যায়ন পত্র (১ম)– শ্যামাপদ দত্ত
নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা (১ম)
–হরেকৃষ্ণ দাস

● দ্বিতীয় শ্রেণী ●

ছড়ার মেলা (২য়) —শ্যামাপদ দত্ত
যুগে যুগে মানুষ (ইতিহাস)- ঐ
পরিবেশ পরিচিতি (ভূগোল, বিজ্ঞান,
স্বাস্থ্য ও সামাজিক)–শ্যামাপদ দত্ত
Happy Primer–S. P. Dutta
মূল্যায়ন পত্র (২য়)–শ্যামাপদ দত্ত

● তৃতীয় শ্রেণী ●

মূল্যায়ন পত্র (৩য়)–শ্যামাপদ দত্ত
ছোটদের ভারত কাহিনী [ইতিহাস]
–অলোক ঘোষ
প্রাথমিক ভূগোল ও বিজ্ঞান–মধুসূদন দেব
ছাত্র-সাথী [প্রশ্নোত্তর, মূল্যায়ন সহ]
–মধুসূদন দেব

● চতুর্থ শ্রেণী ●

মূল্যায়ন পত্র (৪র্থ)–শ্যামাপদ দত্ত
ঐতিহাসিক কাহিনী [ইতিহাস]–মধুসূদন দেব
ছোটদের ভূগোল বিজ্ঞান –মধুসূদন দেব
আধুনিক ছাত্র-সুহৃদ (১ম)
[প্রশ্নোত্তর, মূল্যায়ন সহ]–মধুসূদন দেব

● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ●

মহাজীবনের কথা [বাংলা উপপাঠ্য]
–মধুসূদন দেব
জ্ঞানের প্রদীপ [সাধারণ জ্ঞান]
–অরুণচন্দ্র দেব
প্রশ্নোত্তরে ব্যাকরণ ও রচনা শেখ
–সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র

● পঞ্চম শ্রেণী ●

প্রশ্নোত্তরিকা–[প্রশ্নোত্তর, মূল্যায়ন সহ]
–মধুসূদন দেব

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাইভেট) লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা–৭০০০০৯

বাঁটুল দি গ্রেট

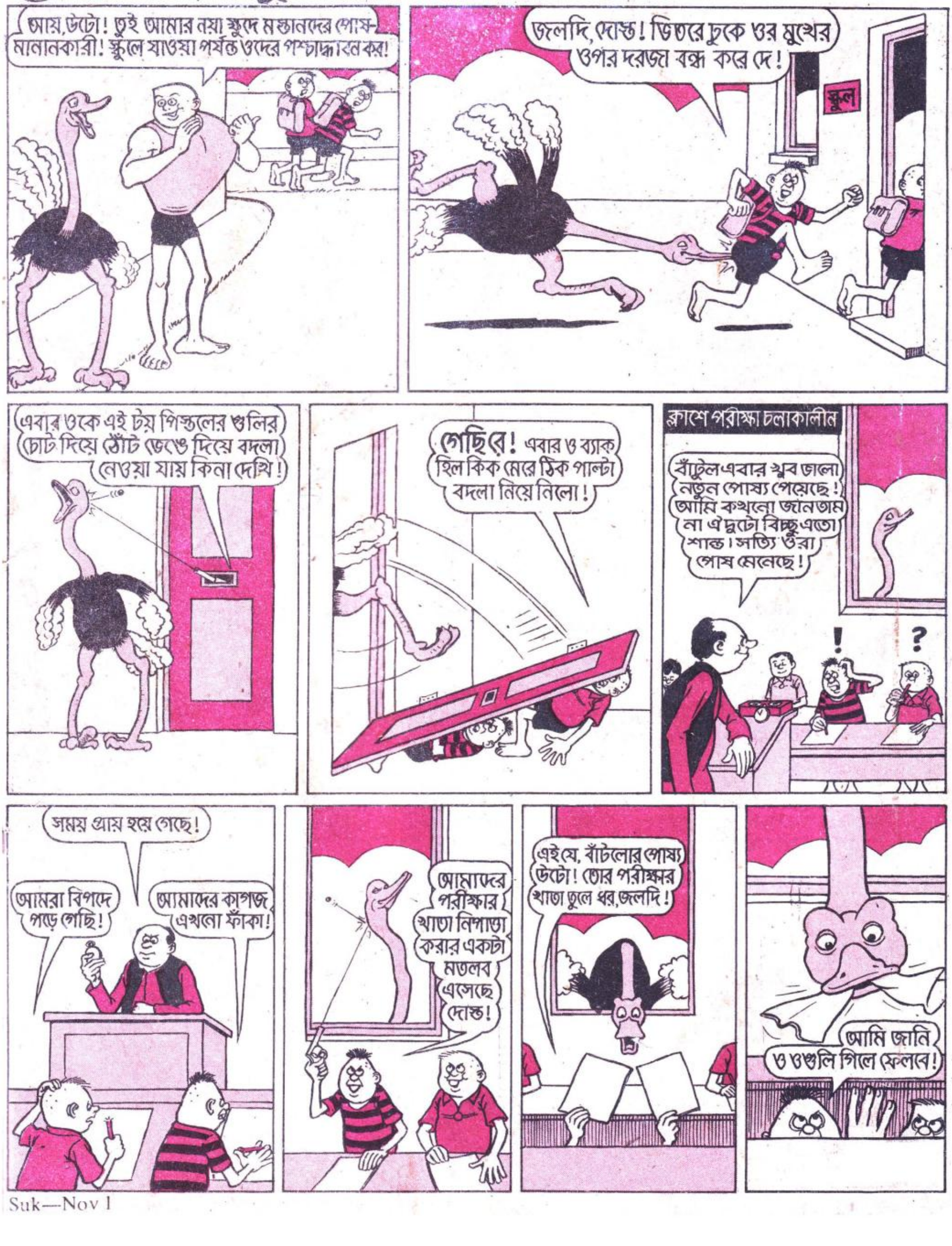

Suk—Nov I

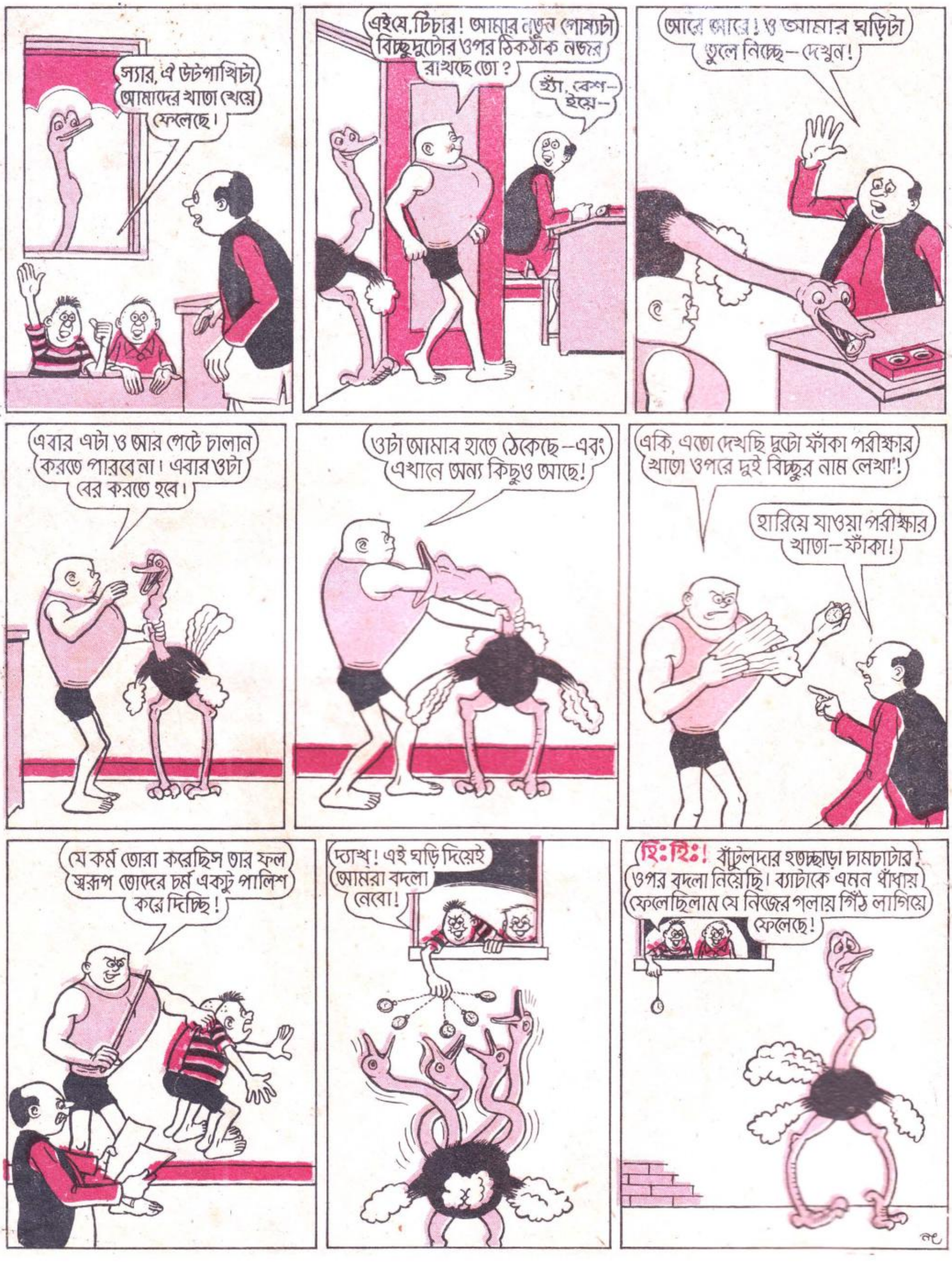
স্যার, ঐ উটপাখিটা আমাদের খাতা খেয়ে ফেলেছে।
এইযে, টিচার! আমার নতুন পোষ্যটা বিচ্ছু দুটোর ওপর ঠিকঠাক নজর রাখছে তো?
হ্যাঁ, বেশ—ইয়ে—
আরে আরে! ও আমার ঘড়িটা তুলে নিচ্ছে—দেখুন!
এবার এটা ও আর পেটে চালান করতে পারবে না। এবার ওটা বের করতে হবে।
ওটা আমার হাতে ঠেকেছে—এবং এখানে অন্য কিছুও আছে!
একি, এতো দেখছি দুটো ফাঁকা পরীক্ষার খাতা ওপরে দুই বিচ্ছুর নাম লেখা!
হারিয়ে যাওয়া পরীক্ষার খাতা—ফাঁকা!
যে কর্ম তোরা করেছিস তার ফল স্বরূপ তোদের চর্ম একটু পালিশ করে দিচ্ছি!
দ্যাখ! এই ঘড়ি দিয়েই আমরা বদলা নেবো!
হিঃ হিঃ! বাঁটুলদার হতচ্ছাড়া চামচাটার ওপর বদলা নিয়েছি। ব্যাটাকে এমন ধাঁধায় ফেলেছিলাম যে নিজের গলায় গিঁঠ লাগিয়ে ফেলেছে!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
ছোটদের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ ১৩৯৭/নভেম্বর ১৯৯০

প্রচ্ছদ
অতিথি (রঙিন ছবিতে গল্প)
–সূত্রধর গুপ্ত

ধারাবাহিক
ত্রয়ীর অভিযান (পোড়া বাড়ির রহস্য)–পরাশর রায় ১০৮
রাক্ষসের দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)–সব্যসাচী ১৩৬
নির্জন দ্বীপের ভয়ংকর (রহস্য উপন্যাস)–রবিদাস সাহারায় ৯৫

রূপকথার গল্প
বুদ্ধিমান মাকড়সা–কারুবাকী দত্ত ৮৬

অলৌকিক গল্প
সর্পশাসন–সলিল বসু ১১২

হাসির গল্প
জকির কাণ্ড–শৈলেনকুমার দত্ত ৯১

গল্প
গোল দিল চিংড়িদা
–দীপক মুখোপাধ্যায় ১৪২
হারাণদা–অরবিন্দ ভট্টাচার্য ১৫৮

শিকারের গল্প
বাঘের মুখোমুখি–পরেশ দত্ত ১১৪

বিজ্ঞানের গল্প
রোবট যখন বন্ধু–শান্তনু চক্রবর্তী ১০৬

রহস্য গল্প
আলট্রা–ভায়োলেট রহস্য
–দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১

পুরস্কৃত গল্প
অব্যর্থ চিকিৎসা (প্রথম)
–সুজিতকুমার পাত্র ১৪৯
বোবা কান্না (দ্বিতীয়)
–গৌতমকুমার গোস্বামী ১৪৯

অগ্নিযুগের সৈনিক
জ্যাকসনের শাস্তি
–শিশিরকুমার মজুমদার ১৪০

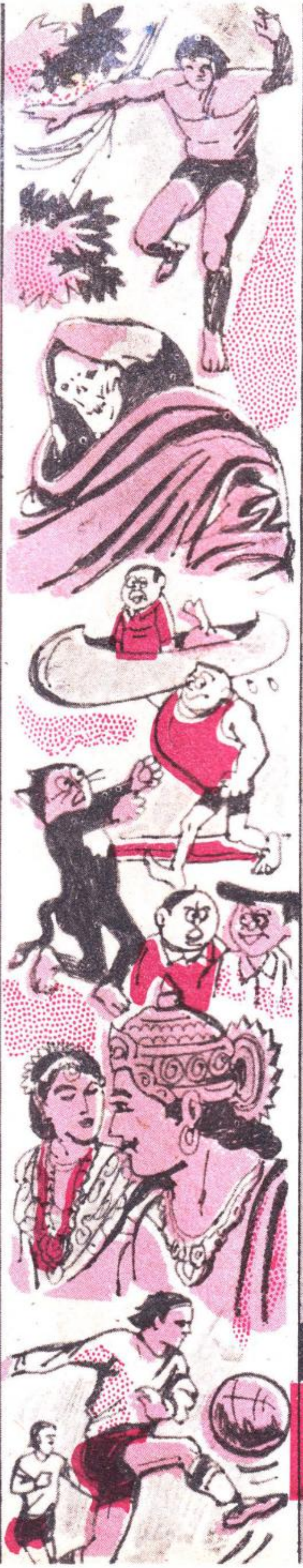

ফিচার
অমৃতের পুত্র–নন্দলাল ভট্টাচার্য ১৩১
এসো শিখি জাগলিং–অভয় মিত্র ১৫৭
বিজ্ঞান সংবাদ–সন্দীপ সেন ১১১

বিশ্ব বিচিত্রা
জিজ্ঞাসা ১০৩
জানা-অজানা–অভিমন্যু ৮৯
অজানা পৃথিবী–অপরাজিতা ১৪৮
সত্যি! ১২৬

কবিতা
আয় ঘুম–প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৮৫

ম্যাজিক
অংকের আজব ম্যাজিক
(রঙিন কমিকসে)–যাদুকর
পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ৯৯

ছবিতে গল্প
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
–নারায়ণ দেবনাথ ৮১
হাঁদা-ভোঁদা–নারায়ণ দেবনাথ ১৩৪
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
–নারায়ণ দেবনাথ ৯০
বিলির বুট (রঙিন) ১০৪
আলপসের তুষার রাজ্যে
ম্যাম'জেল এক্স ১৪৬

বিভাগীয় লেখা
খেলা–শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭
পড়ার সংগে খেলা
–শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
দাদুমণির চিঠি ১২৭
তোমাদের পাতা ১২৯
মজার পাতা ১৩৯
কার্টুন–অমল ৮৮

ঘোষণা
কৃষ্ণা মুস্তাফি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ১৫০
জানো কী ১৫৬

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456(17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

দাম ঃ টাঃ ৫.৫০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য–হাতে নিলে ৬৫ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে–৮০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে–১৪০ টাকা।

R. N. 1 Registration No. 2621/57

আপনার আদরযত্নের
সঙ্গে সঙ্গে ওকে দিন
কমপ্লান!
Complan
বাচ্চার সুস্হসবল থাকা খুবই দরকার, বিশেষ করে লেখাপড়া শেখার সময়। কমপ্লানে ২০% প্রোটিন আছে - যা ওদের সেরা দুধের প্রোটিন যোগায়।
এছাড়া আছে, ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ - যেমন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, রকমারি ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ - বাড়তি পুষ্টির জন্যে এসবই ওদের দরকার। আপনার বাচ্চাদেরও কমপ্লান খাওয়াতে শুরু করুন - দিনে দুবার প্রতিদিন।
Complan
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

GX/59/234 BEN

শুকতারা

৪৩শ বর্ষ □ ১০ম সংখ্যা □ অগ্রহায়ণ ১৩৯৭/নভেম্বর ১৯৯০

আয় ঘুম

প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

খোকা যাবে দেশ সফরে
কোমর বাঁধে পুষি,
মুঠো মুঠো জোছনা দিলাম
পান্না চুনির চুষি।
চাঁদ গুঁড়িয়ে মোয়া বানাই
উড়তি মেঘের খই,
উষার আলোর পদ্ম আনি
বাঘের দুধের দই।
সাগর ঢেউয়ের দোলনা চড়ে
ময়ূরপংখী নায়ে,
যাচ্ছে খোকন সোনার হরিণ
ধরতে অচিন গাঁয়ে।
রামধনুকের বেলুন হাতে
নীলপরী দেয় চুমা,
স্বপনপুরীর খুলল দুয়ার
সোনামানিক ঘুমা।

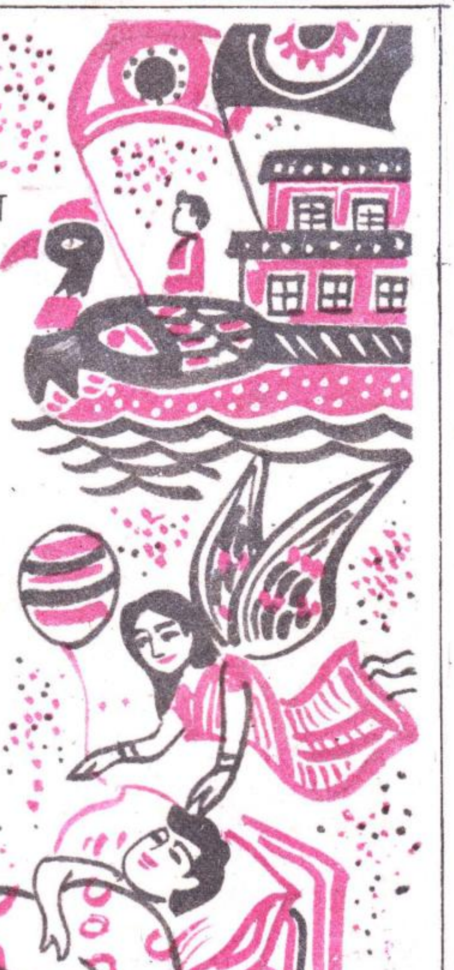

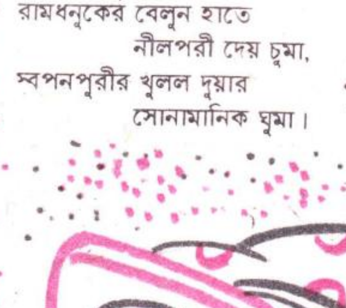

ছবিঃ সুফি

বুদ্ধিমান মাকড়সা

কারুবাকী দত্ত

আফ্রিকার উপকথাতে মাকড়সার এক বিশেষ স্থান আছে। অনেক গল্প তাকে নিয়ে, কারণ, জীবজন্তুর মধ্যে সে যে শুধু সবচাইতে চালাক তাই না, ঈশ্বরের সব কর্মচারীর মধ্যে, তার জায়গাই নাকি সবচেয়ে উঁচুতে। তবে তার নাম কিন্তু প্রথমে আনানমি ছিল না। কোনো নামই আসলে ছিল না তার। চেহারাও মাকড়সার মতো ছিল না মোটেই। নাম আর চাকরি, দুটোই সে যোগাড় করেছিল বুদ্ধি খাটিয়ে। ঈশ্বরকে খুশি করে। আবার বুদ্ধি খাটিয়ে, বেশি চালাকি করতে গিয়েই আনানমি পরিণত হয়েছিল মাকড়সায়। সে গল্পই আজ বলছি।

একদিন আনানমি ঈশ্বরের কাছে একটা যবের শিষ চাইল, আর বলল যে এর বদলে ও এনে দেবে একশ' ক্রীতদাস। ঈশ্বর তো একথা শুনে হেসেই অস্থির। তারপর হাসি সামলে একটু চিন্তা করে ঠিক করলেন, আচ্ছা দেওয়াই যাক না ওকে একটা যবের শিষ, দেখি কি করে সেটা নিয়ে।

আনানমি সেই শিষ ঝোলায় পুরে রওয়ানা হলো পৃথিবীর দিকে। হাঁটতে হাঁটতে, সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছাল এক গ্রামে। তখন রাত হয়ে এসেছে, পথও দেখা যাচ্ছে না ভালো। কোথায় আর যাবে, তাই ভেবেচিন্তে, আনানমি গিয়ে ঢোকা দিল সেগাঁয়ের মোড়লের বাড়ি। মোড়ল খুব যত্ন করে ওকে ডেকে আনল ঘরে। আদর করে নানান রকম খাবার দিল সাজিয়ে। তারপর ঘুমোবার জন্য পেতে দিল বিছানা। শুতে যাবার আগে আনানমি মোড়লকে ডেকে তার হাতে দিল সেই যবের শিষ। বলল যে, সেটা হলো ঈশ্বরের জিনিস, হারিয়ে গেলে মহা মুশকিল, তাই মোড়ল যেন খুব যত্ন করে ওটাকে রেখে দেয়। মোড়ল ভয়ে ভয়ে সেটাকে তুলে রাখল ছাদের ওপর মাচায়।

এদিকে আনানমি তো তাই চেয়েছিল মনে মনে। সে চোখ বুজে শুয়ে রইল বিছানায়, যেন ঘুমিয়েই পড়েছে। যেই বুঝতে পারল যে বাড়ির লোকেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, অমনি চুপি চুপি উঠে নিজেই সেই শিষ থেকে যবের দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে, দিয়ে দিল মুরগীদের। আর পরদিন সকালে লাগিয়ে দিল হৈচৈ কান্ড। ঈশ্বরের জিনিস হারিয়ে ফেলেছি, এখন কেমন করে মুখ দেখাব ওঁর কাছে?

ব্যাপার দেখে মোড়ল তো ভয়েই অস্থির। আনানমিকে শান্ত করার জন্য নিজের গোলা খুলে ওকে এনে দিল এক ঝুড়ি যব। মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে ঝুড়ি মাথায় আনানমি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। খানিক দূর গিয়ে ও থামল গাছের নিচে একটু জিরিয়ে নিতে। আর সেখানেই ওর দেখা হলো এক মুরগীওলার সঙ্গে। ঝুড়িভরা যবের বদলে আনানমি চেয়ে নিল একটা মুরগী।

সেই সন্ধ্যেয় আবার ও গেল এক মোড়লের বাড়ি, আর ঠিক আগের দিনের মতোই বলল খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখতে সেই মুরগী।

সেই রাতেও যেই না ঘুমিয়ে পড়ল বাড়ির সব লোক, আনানমি উঠে, নিজেই কেটে ফেলল সেই মুরগী। পালকগুলো ছড়িয়ে রাখল মোড়লের ঘরের সামনে আর কিছুটা রক্ত লেপে দিল দরজায়। তারপর ঠিক আগের বারের মতোই সক্কাল-বেলায় কান্না জুড়ে দিল মুরগীর জন্য। বেচারি মোড়ল তো কান্ড দেখে অবাক। ভয়ও পেল খুব। কান্নাকাটি করতে লাগল আনানমির পায়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে রাগ পড়ল

আনানমির। রাজী হলো মোড়লকে ক্ষমা করতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মোড়ল, ওকে দিয়ে দিল দশটা ভেড়া।

পথ চলতে চলতে আনানমি সেদিন দেখা পেল একদল লোকের। তারা নিয়ে যাচ্ছিল একটি ছোট ছেলের মৃতদেহ। ভেড়ার বদলে, আনানমি চেয়ে নিল সেই দেহ।

তারপর রওয়ানা হলো আরেক গাঁয়ের দিকে। সেই গাঁয়ের মোড়লকে বলল যে ওর সঙ্গে আছে স্বয়ং ঈশ্বরের ছেলে। বেশি পথ হাঁটা তো অভ্যেস নেই, তাই ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, মোড়ল যেন ওকে শুইয়ে দেয় একটা সুন্দর বিছানায়।

পরদিন সকালে উঠে, আনানমি যাবার জন্য তৈরি হলো। মোড়লকে বলল জাগিয়ে দিতে সেই ছেলেকে। আর গোল বাধল তখনই। প্রাণই নেই যার শরীরে, সে জাগবে কেমন করে? আনানমি তা রেগে আগুন। বলল, গ্রামের লোকেরা মিলে নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে ওকে রাতের অন্ধকারে। ঈশ্বরের ভয়ে মোড়ল তো কাঁপতেই শুরু করল থরথর করে। [illegible] পড়ে গেল সারা গ্রামে। ঈশ্বর রাগলে কি আর রক্ষা আছে কারো?

অনেক ভেবে, মাথা চুলকে, আনানমি বের করল ঈশ্বরকে শান্ত করার এক উপায়। মোড়লকে বলল যোগাড় করে দিতে সেই ছেলের মতো অন্তত একশ' ছেলে। ওরাই গিয়ে ঈশ্বরকে বুঝিয়ে বলবে সব কথা। নিশ্চিন্ত হলো গাঁয়ের লোক। মহাখুশি আনানমিও। সেই একশ' ছেলেকে নিয়ে ফিরে গেল স্বর্গে। খুব মজা করে ঈশ্বরকে শোনাল একটা যবের শিষের বদলে একশ' ছেলে যোগাড় করার গল্প।

আনানমির বুদ্ধি দেখে ঈশ্বর এতই খুশি হলেন যে ওকে উনি দিলেন একটা মস্তবড় চাকরি। আর নাম দিলেন আনানমি।

আনানমির ছিল এক মস্ত খামারবাড়ি। অনেক রকম ফসল ফলত সেখানে। সেই দেশেই ছিলেন এক মহারাগী রাজা। আর তাঁর ছিল এক মস্তবড় ভেড়া। সেই ভেড়াকে রাজা এমনই ভালবাসতেন যে কাউকে হাতই দিতে দিতেন না তার গায়ে।

একদিন হয়েছে কি, সেই ভেড়া এসে ঢুকে পড়েছে আনানমির খামারে। মনের আনন্দে খেয়েছে সব তরিতরকারি। আনানমি বিকেলে এসে দেখে যে ভেড়া তখনও ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিবোচ্ছে সব শাকপাতা। রাগের চোটে রাজার হুকুম বেমালুম ভুলে গিয়ে আনানমি দুহাত দিয়ে এক ভারী পাথর তুলে, ছুঁড়ে দিল সেই ভেড়ার দিকে। আর আনানমির কপালও এমন যে মরেই গেল ভেড়াটা।

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আনানমি ভাবছে কেমন করে এড়ানো যায় রাজার রাগ। এমন সময়ে, টুক করে গাছ থেকে পড়ল একটা বাদাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় খেলে গেল বুদ্ধি। ভেড়াটাকে নিয়ে ও উঠে গেল গাছে আর ওকে ঝুলিয়ে রাখল একটা ডালে। তারপর ডাকতে গেল ওর বন্ধুকে। খুব করে লোভ দেখাল বাদাম খাওয়ানোর। বাদামের লোভে বন্ধু যখন এল গাছের কাছে, তখন আনানমি বলল গাছ ধরে খুব জোরে ঝাঁকাতে। ঝাঁকানো মাত্রই বাদামের সঙ্গে ঝুপ করে গাছ থেকে পড়ে গেল সেই ভেড়া। আনানমি অমনি বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল সেই ভেড়াকে মেরে ফেলার দোষ।

বন্ধু তো ভয়েই অস্থির। রাজার রাগ হলে প্রাণ বাঁচার কোনো আশাই আর নেই। দুজনে মিলে পরামর্শ করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আনানমি বোঝাল যে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে

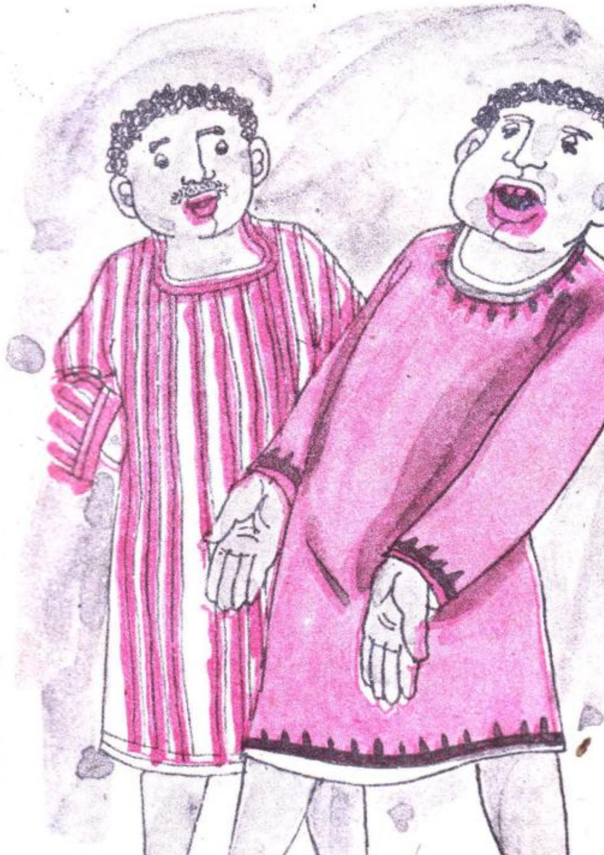

আরে ভেড়াটা তো আমি মেরেছি।

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মাটিতে।

হয়তো বা কমতে পারে রাজার রাগ।

রাজপুরীর দিকে রওয়ানা হলো বন্ধু। পথেই পড়ে তার বাড়ি। মনে হলো, যাই, একবার দেখা করে বউকে বলে যাই সব কথা। কে জানে এর পর আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা আমাদের!

বন্ধুর বউ ছিল দারুণ বুদ্ধিমতী। সব কথা শুনেই সে বলল, আরে, তুমিও যেমন, দেখেছ কোনোদিন কোনো ভেড়াকে গাছে উঠে লুকিয়ে থেকে বাদাম খেতে? এসবই আসলে হলো, তোমার দুষ্টু বন্ধু আনানমির কারসাজি।

এর পর বউ কানে কানে বন্ধুকে দিল এক বুদ্ধি। আনানমিকে কিছু না বলে, বউএর কথামতো বন্ধু আনানমির বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল রাজবাড়ি। ঘুরেও এল একটু পরই। হৈ হৈ করে আনানমিকে বলল যে রাজার কাছে গিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। সব শুনে রাজা রাগ তো করেনই নি, বরং ভেড়াটা থেকে একটুকরো মাংস ওকে কেটে দিয়েছেন খেয়ে দেখতে।

এ কথা শুনে আনানমির তো দারুণ আফশোস। হাত-পা ছুঁড়ে ও বলে ফেলল, আরে ভেড়াটা তো আসলে আমিই মেরেছি। তাই মাংসটা আমারই পাওনা, শীগগির দাও আমাকে আমার ভাগ।

এভাবে সত্যি কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় বন্ধু বাঁচল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আরেকটু হলেই আনানমির দোষে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! সঙ্গে সঙ্গে সে আর তার বউ আনানমিকে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

প্রিয় ভেড়াকে মেরে ফেলেছে শুনে তো রাজা রেগে আগুন। কোনো কথাই শুনলেন না। আনানমিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। সেই আঘাতে আনানমির দেহ হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। এজন্যই ও এখন এত ছোট হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ির আনাচে কানাচেয়। দেখলেই মনে হয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ওর শরীর।

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

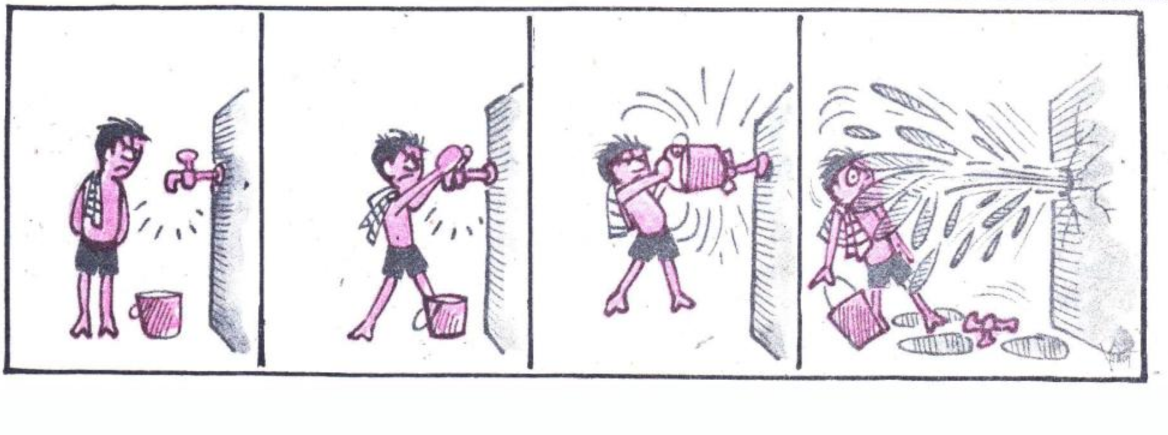

জানা অজানা

মৃত্যুর পরও মানুষের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে

মৃত্যুর পর মানুষের হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও আধঘন্টা থেকে দু ঘন্টা পর্যন্ত মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। এই সময়ের মধ্যে Electroencephalogram যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে মস্তিষ্কের স্পন্দন বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ মস্তিষ্ক তখনও সক্রিয় রয়েছে। তবে ওই সময়ের পর মস্তিষ্ক থেকে আর কোনো সংকেত পাওয়া যায় না। তখন বাস্তবিকই মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্ককে আর কোনোভাবেই সক্রিয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটার আগে ম্যাসাজের সাহায্যে হৃৎপিন্ডকে সক্রিয় করা সম্ভব বা মস্তিষ্ক থেকে পাঠানো স্নায়ুর স্পন্দন থেকে হৃৎপিন্ড আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। মানুষ ফের বেঁচে উঠতে পারে। হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যাবার ঠিক পরবর্তী অবস্থাকে ক্লিনিকাল ডেথ্ বলে। মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকতে থাকতে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে চোখ, কিডনি ইত্যাদি জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের (transplantation) উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেয়া দরকার।

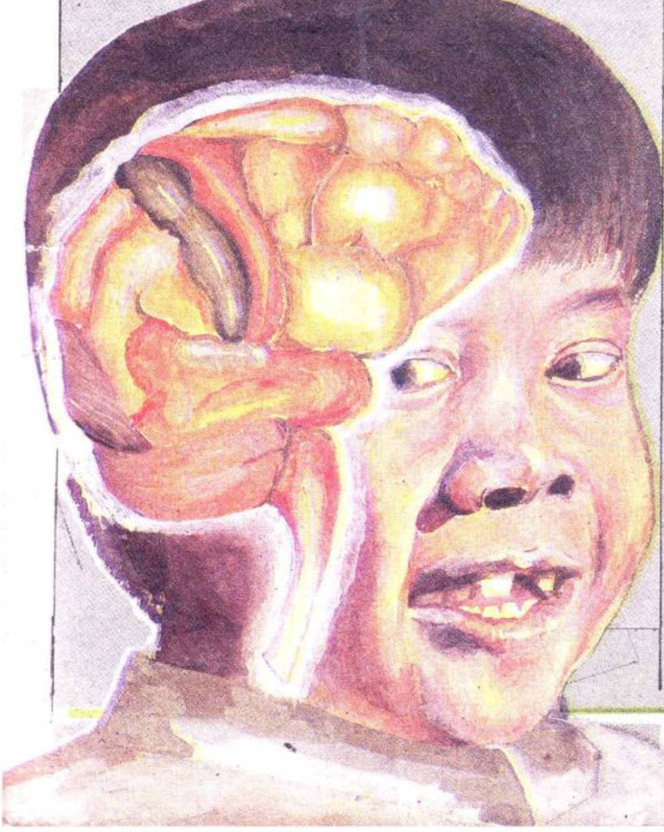

চাঁদে দাঁড়িয়ে কি ধ্রুবনক্ষত্র স্থির দেখা যায়?

উত্তর গোলার্ধ থেকে উত্তর আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রকে সারারাত একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু চাঁদে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। অবশ্য চাঁদ থেকে একই নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখা যায়। তবে আমাদের ধ্রুবনক্ষত্র মহাকাশে একই জায়গায় থাকবে না, অন্য নক্ষত্রের সংগে ঘুরবে। কারণ চাঁদের বিষুবরেখা ১.৩৫^{0} হেলে আছে সৌরজগতের অন্য গ্রহদের ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে। পৃথিবী হেলে আছে ২৩.৩০^{0}, তাই অক্ষরেখা বিভিন্ন দিকে দেখা যায়। ইউরেনাস থেকে আমাদের সূর্যকে প্রায় ধ্রুবনক্ষত্রের মতো মনে হবে–একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, কারণ ইউরেনাসের অক্ষরেখা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।

সৌরলোকের শেষ প্রান্তের গ্রহ প্লুটো বা নেপচুন থেকে দেখলে নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বদলাবে না।

সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র Proxima Centuari। তাই ওই দুটি গ্রহ থেকে রাতের আকাশকে ছোট মনে হবে। কারণ নিকটবর্তী নক্ষত্রের চাইতে অন্য নক্ষত্রপুঞ্জ অনেক দূরে। সপ্তর্ষি ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে। অথচ Proxima Centuari-র দূরত্ব মাত্র ২½ আলোকবর্ষ।

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

বাহাদুর বেড়াল

এই সাইনবোর্ড লিখে আমি একটা বেশ ভালো কাজ করছি।
এই
আমার সেরা কুকুরকে পথ দাও, ও সেরা পুরস্কারটা জিতবে!
ঐ লোকটা ঠিক বলে নি, আমার চিতাই সেরা পুরস্কারটা জিতবে!
দ্যাখো! ঐ চিতাটা আমার কুকুরকে আক্রমণ করছে!
ইঁয়োফ্!
থাম! ফিরে আয় ফুটকি!
পরে
সব থেকে ভালো গায়ে ফুটকি-ওয়ালা পশুর বিশেষ পুরস্কার জিতেছে—
বাহাদুর, ফুটকিওয়ালা বেড়াল!
পোষ্যপ্রদর্শনী

জকির কান্ড

শৈলেনকুমার দত্ত

পিকনিকের নাম শুনেই রাজীব লাফিয়ে উঠল। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ও ভীষণ উৎসাহী। উত্তেজনার ঝোঁকে ও কেবল জিজ্ঞেস করল–কবে কবে কবে?

কেষ্টদা গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলল–কবে সেটা তো বড় কথা নয়, কোথায় করা হবে সেটাই আগে ঠিক কর।

রাজীব শংকরের দিকে তাকাতে, শংকর আমতা আমতা করে বলল–দিল্লী রোডের কাছে আমার মামা যে বাগানবাড়িটা কিনেছেন, ওটা যদি সকলের পছন্দ হয় তো আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

পছন্দ না-করার কি আছে! ওটা তো আমরা একদিন দেখে এসেছি। ভালই তো রে! বেশ গ্রাম-গ্রাম ভাব, পুকুর আছে, বাগান আছে, দু'তিনটে ঘরও আছে। ইচ্ছে করলে রাত কাটানোও যাবে। ওটাই ঠিক কর। বলেই কেষ্টদা ইশারা করে তারকদাকে এক ভাঁড় চা দিতে বলল।

দেবু এতক্ষণ সব শুনছিল, কেষ্টদার কথা শেষ হতে বলল–ওখানে রাত কাটানোর কী আছে! ওই তো এইটুকু পথ, দিনে-দিনেই ফিরে আসা যায়।

রাজীব বলল–হ্যাঁ, তা হয়তো যায়, কিন্তু কি জানিস পিকনিক সেরেই ফিরে এলে ঠিক আনন্দ হয় না। আর ফেরার সময় বড্ড ক্লান্ত লাগে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কেষ্টদাও সায় দিল, আমাদের যখন থাকার জায়গা রয়েছে, তখন এত কষ্ট করতে যাব কেন! শংকরের মামার বাড়িতে থাকব বললে তো বাড়িতে কেউ আপত্তি করবে না!

শংকর বলল–তা হয়তো করবে না, কিন্তু জায়গাটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা!

ধ্যুস! কেষ্টদা চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল–তোদের সেই ভয় ভয় ভাবটা আর গেল না। এখনও কি সেই কচি খোকাটি আছিস!

দেবু বলল–ঠিক আছে, তাই হবে। এখন কী কী আইটেম হবে এবং কবে যাওয়া হবে সেসব ঠিক কর।

তারকদার চায়ের দোকানে বিবর্ণ আধছেঁড়া ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে কেষ্টদা বলল–উনিশ তারিখে তো দেখছি রবিবার, ওই দিন চল।

সেই ভাল। দিন-নির্বাচনে আমরা সকলেই একমত হলাম।

কেষ্টদাকে কিছু বলার আগেই কেষ্টদা পকেট থেকে কাগজ আর পেন বের করে বলল—মেনুটা ঠিক করা যাক, কি বলিস? মুরগির মাংস তো থাকছেই, মাছ-তরকারি কিছু করবি?

ওসব মামার ওখানে পাওয়া যাবে, শংকর থামিয়ে দিয়ে বলল—কিন্তু যাবে কী করে?

কেন! রাজীবের পিসির সেই গাড়িটা পাওয়া যাবে না? কেষ্টদা রাজীবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজীব বলল—তা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু ওটাতে তোমরা আবার চাপবে তো?

হাসতে হাসতে কেষ্টদা বলল—তা যা বলেছিস। তবে গাড়ি তো একটা, তাহলেই হলো। পিকনিকের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা!

সেবারের ব্যাপারটা শংকর জানতো না, ও সেবারে যায়নি আমাদের সংগে। ও জিজ্ঞেস করল—সেবারে কী হয়েছিল?

কেষ্টদা রাজীবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—কিরে রাজীব, বলব?

রাজীব গম্ভীর গলায় বলল—বল না। আমার পিসির গাড়িটা খুব পুরনো, ওরকম একটু আধটু হবে।

শংকর আবার জিজ্ঞেস করল—কোথাও ধাক্কাটাক্কা মেরেছিল?

কেষ্টদা বলল—না না, ওসব কিছু নয়। গাড়িটা চললে জেট প্লেনের মতো ধোঁয়া বেরোয় এই যা। সেবারে খুব জোরে হর্ন দিতে এক ভদ্রলোক খুব ধমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—হ্যাঃ, এই গাড়ি আবার হর্ন দেয়!

সে যাক গে। এখন ঠিক কর, কী কী সংগে নেওয়া হবে, হাতে তো আর বেশি সময় নেই। এতক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার আমি তাড়া লাগালাম।

কেষ্টদার ততক্ষণে লিস্ট হয়ে গেছে। কার কত চাঁদা, কে কোন জিনিসটা নেবে ইত্যাদি সব কিছু। সকলের চাঁদা হলো পঁচিশ টাকা করে, কেষ্টদার শুধু এক টাকা বেশি।

কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে রাজীব বলল—কেষ্টদা, তোমার এক টাকা বেশি কেন?

কেষ্টদা বলল—বেশি নয় রে, আমার পঁচিশ টাকাই আছে, এক টাকা আমার কুকুরের জন্যে।

তুমি আবার সেই খেঁকী কুকুরটাকে নেবে? রাজীব কেষ্টদাকে একটু ক্ষেপিয়ে দিল।

কেষ্টদার এই এক ব্যাপার। পুষেছে তো একটা নেড়ী কুত্তা, তাকে আবার খেঁকী কুকুর বলা যাবে না। বলতে হবে ডোবারম্যান!

এবারেও রেগে উঠত, কিন্তু দেবু ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্যে বলল—না রে, বিপদে পড়লে এই খেঁকী কুকুরই বাঁচায়। একটা সংগে থাকা ভাল, বিদেশ-বিভুঁই, বলা যায় না, রাত-বিরেতে কাকে লাগে না লাগে।

কেষ্টদা মনে মনে বেশ খুশি হলো। রাজীবের হাত থেকে ফর্দটা নিয়ে খসখস করে কি সব লিখতে লাগল।

এসব কাজে আমাদের দলপতি একেবারে ওস্তাদ। কোথায় কোন জিনিসটা সস্তা, কোন জিনিসে কতটা আয় দেয়—এসব একেবারে নখদর্পণে। আর কাজে-কম্মেও কেষ্টদার জুড়ি নেই। আমরা তো সবাই কথার জাহাজ, কেষ্টদা না-গেলে কারও মুখে আর অন্ন জুটবে না।

মাঝখানের দিনগুলো যে আমরা কী করে কাটালাম, সে বোধহয় আমরা নিজেরাও বলতে পারব না। জমতে জমতে তো জিনিসপত্রের পাহাড় তৈরি হলো। রান্নার সাজ-সরঞ্জাম, শতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ ঝামেলার আর শেষ নেই।

রবিবার আমরা খুব সকালেই তৈরি ছিলাম, কিন্তু গাড়িটা এল বেশ বেলা করে। গাড়ির মধ্যে কখনও আটজন ধরে! তবু কেউ সিটে, কেউ কোলে এইভাবে কোনোরকমে চাপাচাপি করে বসলাম। কেষ্টদার কুকুরটাকেও ঢোকান হলো।

এমনিতে এক ঘন্টার জার্নি, কিন্তু গাড়ির গুণে আমাদের পৌঁছাতে তিন ঘন্টা লাগল। চাপাচাপিতে এতক্ষণ পা সোজা করতে পারি নি! কেষ্টদার কুকুরটা কিন্তু নেমে দিব্যি লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

শংকরের মামা দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের জন্য। গাড়ি থেকে নেমে কেষ্টদা তাঁর সংগে কথা বলল। মামাবাবু আমাদের সকলের নামগুলো আর একবার জেনে নিলেন—আমি, দেবু, রাজীব, শংকর আর কেষ্টদা তো তাঁর বিশেষ পরিচিত। নতুনদের মধ্যে ছিল অরূপ, বুবুল আর মধু।

ঘরের চাবিগুলো কেষ্টদার হাতে দিয়ে মামাবাবু বললেন—সব দেখে শুনে নিও। কোনো অসুবিধে হবে না। আর যুধিষ্ঠির তো রইল, দরকার পড়লেই ওকে ডাকবে। তোমাদের রান্নাবান্নার জন্যে ও উনুন তৈরি করে রেখেছে, আর কাঠ তো কাটাই আছে।

ব্যস, ব্যস! কেষ্টদা যেন এতটা আশা করেনি। মামাবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বলল—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হাসতে হাসতে মামাবাবু চলে গেলেন।

কেষ্টদা এবার ঘরগুলো খুলল। তারপর জামাকাপড় আর শালটাকে পরিপাটি করে রেখে দিয়ে একটা রঙচটা লুংগি পরল। আমরা গাড়ি থেকে মালপত্রগুলো নামাচ্ছিলাম, কেষ্টদা চিৎকার করে ডাকল সবাইকে—এই তোরা এদিকে আয়। কটা বাজল জানিস! জলখাবারের পর্বটা তাড়াতাড়ি শেষ কর—ডিমগুলো কোথায় রেখেছিস?

রাজীব এসেই পেয়ারা গাছে উঠতে যাচ্ছিল, কেষ্টদা বলে উঠল—উঁ হুঁ হুঁ, এখন ওসব না। চা খেয়ে সবাই কাজে লেগে যা। না হলে কিন্তু চারটেতেও ভাত জুটবে না! মুরগির ঝুড়িটা নিয়ে তুই বসে পড়।

কেষ্টদার এই ভাবটা বেশ ভাল লাগে। একটু মানলে একেবারে একাই একশ'। কেষ্টদা যা যা বলে, ওগুলো বিশ্বাস

করি, না-করি চুপ করে থাকলেই হলো। সকলেই তো জানি, এ তো আর নতুন কিছু নয়। কিন্তু রাজীব শুনবে না, একটু করে ফুট কাটবে আর কেষ্টদা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে!

খেতে বসেও সেই এক কান্ড হলো।

এমনিতেই বেলা তখন তিনটে, খিদেতে পেট একবারে চুঁই-চুঁই করছে। তারওপর রান্নাও কিছু কম হয়নি–ভাত, বেগুনভাজা, আলুভাজা, ফুলকপির তরকারি, মাংস এবং টমাটোর চাটনি। আমরা কোনোরকমে চান সেরে খেতে বসে গেলাম। কেষ্টদা কিন্তু পরিপাটি করে পুকুরে চান করে এল।

রান্নাবান্না ভালই হয়েছিল, খাওয়াটাও জব্বর হলো। কেষ্টদা অবশ্য সকলের থেকে বেশিই খেল। যা খাটাখাটুনি, সবই তো কেষ্টদার ওপর দিয়েই গেছে! আমরা তো যোগাড়ের দল। কেষ্টদার খাওয়াটা বেশি হতেই পারে। তবু পরিমাণ দেখে আমরা চোখ টিপে হাসাহাসি করছিলাম। কিন্তু রাজীব ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসল–কেষ্টদা, তুমি ইচ্ছে করলে একটা পোলট্রি খেয়ে ফেলতে পারো, তাই না?

বেশি খেতে পারার গর্ব কেষ্টদা নিজেই করে, কিন্তু রাজীবের টিপ্পনী শুনে ভীষণ চটে গেল। শেষ পর্যন্ত অনেক সাধাসাধি করে তাকে শান্ত করা হলো। আর এসব কান্ড দেখে কেষ্টদার নেড়ী কুত্তা 'জকিবাবু'র সে কী গর্জন!

কেষ্টদা উঠল প্রায় এক ঘন্টা পরে। প্রভুর খাওয়ার পরে সেই পাহাড়প্রমাণ হাড় নিয়ে পড়ল কেষ্টদার কুকুর। সেও একটা ক্ষুদে রাক্ষস! রাজীব অবশ্য তার খাওয়াটা দেখেনি। ওরা তখন ওদিকে ক্রিকেট খেলছিল। দেখলে হয়তো আবার একটা কান্ড হতো।

একে বেলা করে খাওয়া তারওপর শীতের ছোটবেলা! একটু পরেই আমাদের ঘরে ঢুকে পড়তে হলো। কোথায় রইল সব খেলার সরঞ্জাম। বয়ে বয়ে আনাই সার! কেষ্টদার ইচ্ছে ছিল একটু শোবার, কিন্তু আমরা শুতে দিইনি। কোনো কিছুই যখন খেলা হলো না, তখন গল্প হোক। গল্প তো নয়, কেষ্টদার গালগল্প! এটার জন্যেই তো আসা। প্রসংগ ঠিক করার দরকার নেই, যে কোনো প্রসংগই হোক কেষ্টদার জীবনে একটা ঘটনা আছেই।

বড় ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা হলো। কেষ্টদাকে মধ্যমণি করে আমরা বসলাম। যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হলো, এমন কি ড্রাইভার মুকুন্দদাকেও।

কথায় কথায় সেদিন ভূতের প্রসংগই উঠল। ইচ্ছে করে কেউ এটা বলেনি। অন্ধকার ঘরের মাঝখানে একটা ছোট কুপির আলোতে সকলের লম্বা লম্বা ছায়াগুলোই আমাদের ভূতের কথা মনে করিয়ে দিল। তারওপর কুচকুচে কালো যুধিষ্ঠিরের ধবধবে সাদা দাঁতের হাসি! সেও এক ভূতুড়ে ব্যাপার।

কেষ্টদা তাচ্ছিল্যের সংগে জিজ্ঞেস করল–কিরে যুধিষ্ঠির, তোদের এখানে ভূতফূত আছে নাকি?

যুধিষ্ঠির হেসে বলল–নাঃ, ভূত থাকবে কোথায়, যা চোর ডাকাতের উপদ্রব!

সে কিরে! এখানে চুরি ডাকাতির আছেটা কী!

যুধিষ্ঠির বলল–কেন এত গাড়ি যাচ্ছে, চুরি করার ভাবনা! মাঝে মাঝেই তো এখানে একটা দুটো লাশ পড়ে থাকে।

আমরা ব্যাপারটায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু দেবু হঠাৎ বলল–আচ্ছা, আসবার সময় ওদিকটায় দেখলাম পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিছু হয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ, পরশু রাত্রেই ওখানে একটা লোকের মুন্ডু পাওয়া গেছে!

শংকর ঢোঁক গিলে বলল–শুধু মুন্ডু? ধড়টা গেল কোথায়?

সেটাই তো কথা! যুধিষ্ঠির বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

কেষ্টদা অভয় দিয়ে বলল–আরে দূর, দেখগে যা, ওসব অন্য ব্যাপার। তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন, আমাদের কাছে আছেটাই বা কী!

অন্ধকারে যুধিষ্ঠিরকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তবে ওর কথা শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। যুধিষ্ঠির বলল–ওরা নাকি মানুষের কংকালটা নেয়, কোথায় যেন চড়া দামে বিক্রি হয়।

এটা তো আর আমাদের কাছে নেই বলা যাবে না। তবু আমরা সকলে কেষ্টদার মুখের দিকে তাকালাম। কেষ্টদা বলল–আরে বাবা জকি তো রয়েছে! ওকে না মেরে তো কিছু করতে পারবে না। ততক্ষণে আমরাও একটা কিছু ঠিক করে ফেলব।

কেষ্টদার নির্দেশে আমাদের এসব আলোচনা তখনই বন্ধ করতে হলো। যুধিষ্ঠিরকেও যেন কেষ্টদা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। যুগটাই যে এমন হয়েছে, কুকুর ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা চলে না।

সে রাতে আর আমরা বিশেষ কিছু খেলাম না। কেষ্টদা শুধু বাকি মাংসটা খেয়ে নিল। বলল–না খেলেও চলত, কিন্তু মাংসটা তো নষ্ট হবে, এই বাজারে অতগুলো টাকা! খাওয়া-দাওয়ার পর মাংসের হাড়গুলো নিয়ে কেষ্টদা একটা কৌটোর মধ্যে রেখে দিল।

আমরা তো অবাক। কেষ্টদা বলল–জকিকে আর রাত্রে কিছু খেতে দেব না। খেতে দিলেই বেটা ঘুমোবে। আজকের রাতটা ওর জেগে থাকা দরকার। কাল সকালে হাড়গুলো দিলেই চলবে।

মতলবটা মন্দ নয়। পেটে খিদে নিয়ে আর কে ঘুমোতে পারে!

একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর রীতিমতো ঠান্ডা।

আমরা সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু কারুরই ঘুম আসছিল না। একা রাজীব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

দুটো তক্তপোশে সার সার আমরা সবাই শুয়ে আছি।

শীতের জন্যে আটজনের শুতে কোনো অসুবিধে হয়নি। আমার সবচেয়ে কাছে আছে কেষ্টদা। পাশের ঘরে জকি মাঝে মাঝেই চিৎকার করছে—কারণে, না অকারণে সেটা সম্ভবত কেষ্টদাই বলতে পারবে।

একবার মনে হলো কেষ্টদাকে ডাকি। কিন্তু কি ভেবে আর ডাকলাম না। কেষ্টদার ব্যাপার, ডাকলেই বলবে—ঘুমটা বেশ এসেছিল, দিলি তো নষ্ট করে!

রাত তখন কটা কে জানে, হঠাৎ ভীষণ জোরে একটা শব্দ হলো। সংগে সংগে পাশের ঘরে একটা কিছু যেন গড়িয়ে গেল। শব্দ শুনে মনে হলো, আমাদের আনা পিতলের বড় হাঁড়িটা মেঝেতে গড়াচ্ছে।

সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছল, কিন্তু কেউ কথা বলিনি। ভয়ে গলা যেন একেবারে কাঠ হয়ে আসছে। কেষ্টদা আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করল।

রাজীব ফিস ফিস করে বলল—বাসনগুলো তো সব নিয়ে যাবে, চল, সবাই মিলে একবার চেঁচাই অন্তত।

কেষ্টদা তবু চুপ করতে বলল।

দেবু জিজ্ঞেস করল—কেষ্টদা, তোমার কুকুরটার গলা পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা গেল কোথায়?

কেষ্টদা ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল—সেটাই তো ভাবছি! ওকে আবার মেরে ফেলেনি তো? ও তো বেইমানি করার জীব নয়!

সেটা অবশ্য ঠিক কথা। শুধু কেষ্টদার কেন, যে কোনো কুকুর এটুকু অন্তত করবে।

একটু পরে আবার একবার ধড়ফড় করার আওয়াজ হলো, তারপর সব চুপ।

আমাদের সকলের আশঙ্কাটা এবার বদ্ধমূল হলো। কেষ্টদার কুকুরটাকে তাহলে সত্যি সত্যিই মেরে ফেলেছে।

বাকি রাতটা আর কেউ একটা কথা বলতে পারিনি। আগে সকলের প্রাণগুলো বাঁচুক, বাসনের ওপর দিয়ে যায় তো যাক!

ঘণ্টা তিনেক কোনো শব্দটব্দ নেই, তারপর জানলা দিয়ে বেশ আলো দেখা যাচ্ছে। দেখলাম—যুধিষ্ঠিরও ঘোরাঘুরি করছে।

এখন ওঠা যেতে পারে।

কেষ্টদা এবার উঠে বসল। ঘরের দরজাটা খুলে অসহ্য উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা সকলে মিলে এগিয়ে গেলাম পাশের ঘরটার দিকে। ঘরটার একটা জানলা খোলা ছিল। গরাদ সরিয়ে ওদিক দিয়ে যে কেউ ঢুকতে পারে। ঘরে ঢোকার আগে আমরা মনে মনে একটা ছবি কল্পনা করে রেখেছিলাম—মেঝেতে জকির রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে, আর বাসন-কোসন হাওয়া!

ঘরে ঢুকে কিন্তু সকলেই অবাক। বাসন-কোসন একটাও খোয়া যায়নি, ঘরের চারদিকে ছড়ানো। আর মেঝেতে জকির রক্তের বদলে বাসী মাংসের ঝোল গড়াচ্ছে। টক গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

কী ব্যাপার! জকি গেল কোথা! কেষ্টদা জানলার দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলল—তবে কি ওরা জকিকেই নিয়ে গেছে!

রাজীব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—জকিকে কি করতে নিয়ে যাবে! বলেই সে জকি-জকি করে ডাকতে লাগল।

কিসের যেন একটা আওয়াজ হলো। এবার কেষ্টদাও চিৎকার করে ডাকল—জকি!

ঘরের কোণে একটা পুরনো চুনবালির বড় ড্রাম ছিল, তার আড়াল থেকে জকি বেরিয়ে এল। তার সর্বাংগে ধুলো আর ঝুল। আর মুখে আটকে আছে হাড় রাখার সেই কৌটোটা।

কেষ্টদা এক লাফে তার কাছে গিয়ে কৌটোটা খুলে নিল। মাংসের হাড়গুলো যে এটার মধ্যে রাখা ছিল, ও বেটা গন্ধ শুঁকে ঠিক বের করেছে। কিন্তু সব হাড়গুলো বার করতে গিয়েই গণ্ডগোলটা হয়েছে। মুখের সবটা ঢুকিয়ে দিয়ে আর বের করতে পারেনি।

কৌটোটা খুলে নিতে জকি অনাবশ্যক কয়েকবার চিৎকার করল। ভয়ে, না আনন্দে, না আওয়াজটা যাচাই করার জন্যে, কে জানে!

সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে কেষ্টদা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল—যাক, জকির যে দম বন্ধ হয়নি সেটাই আমাদের সৌভাগ্য।

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি এমন সময় রাজীব বলল—যেমন কেষ্টদা, তেমনি তার কুকুর। রাম পেটুক!

কেষ্টদা কিন্তু রাজীবের কথায় একটুও রাগল না। শুধু জকির মুখের চারপাশটা তীক্ষ্ণভাবে দেখে দেবুর দিকে তাকিয়ে বলল—ডেটলের শিশিটা আর একটু তুলো দে তো।

ছবি : সরোজ সরক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবিদাস সাহারায়

পাঁচ

স্বপন ও বরুণ উড়ন্ত কাগজটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—গেল! গেল!

টমও গর্জন করে উঠল—ঘেউ! ঘেউ! আর সংগে সংগে সে এক আশ্চর্য কান্ড করে বসল। লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ততক্ষণে কাগজটি জলে পড়ে স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলেছে। টমও সাঁতরিয়ে কাগজটি ধরবার জন্য এগোল।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল সেই নাটকীয় ব্যাপার। জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কাগজ, টমও সাঁতরাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু ধরা খুব সহজ নয়। কাগজটা তখনও অনেক দূরে। টম সাঁতার কেটেও সেটা ধরতে পারছে না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সাবাস্—সাবাস্ টম! এবার সত্যি সে কামড়ে ধরেছে কাগজটা। স্বপন ও বরুণ আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

টম এবার ফিরে আসতে লাগল জাহাজের দিকে। অরুণ বলল—সুভাষ, দড়ি ফেলো। টমকে তো ওপরে ওঠাতে হবে।

সুভাষ তাড়াতাড়ি জাহাজের নোংগর বাঁধবার খুঁটির সংগে একটি কাছি শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর নিজেই কাছি ধরে ঝুলে পড়ল নিচে, একেবারে জলের কাছাকাছি।

টম তখন জাহাজের সামনে এসে পড়েছে। সুভাষ এক হাত বাড়িয়ে টমকে জড়িয়ে তুলে নিল। ওপরের সকলে তখন কাছি টেনে ওদের দুজনকে ডেকে তুলে নিল। ডেকে উঠে সুভাষ টমের মুখ থেকে কাগজটা নিয়ে বাড়িয়ে দিল অরুণকে।

স্বপন টমের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, সাবাস, টম। সাবাস।

সবার কাছেই টমের আদর খুব বেড়ে গেল। বরুণের হাতে দু'তিনখানা বিস্কুট তখনো ছিল। সে আদর করে টমকে খেতে দিল।

কাগজটা জলে ভিজে গিয়েছিল। সেটাকে ভালভাবে মেলে ডেকের ওপর শুকোতে দেওয়া হলো। অনেক অক্ষর ঝাপসা হয়ে গেছে। আগে পড়ে যদিও কিছুটা মর্ম উদ্ধার করা যেত—এখন তা আরও মুশকিল হয়ে উঠল। তলার দিকে আঁকা আছে একটি ছবি, সেটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায় একটি সিঁড়ি আঁকা। তার নিচে একটি ঘর। সেখানেও কি আঁকা রয়েছে। জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে গেছে জায়গাটা। ওখানেই কি আছে সেই গুপ্তধন?

অরুণ বলল—আজকেই আমাদের সন্ধানের কাজ শুরু করতে হবে। দেরি করা কিছুতেই উচিত নয়। এসো, আগে জাহাজটা ভাল করে খুঁজে দেখি। এখানে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তারপর দ্বীপের ভিতর খুঁজব।

সুভাষ বলল—হ্যাঁ, ঠিক। জাহাজটা যখন আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে, তখন এখানেই আগে খোঁজ করা দরকার।

বরুণ বলল—বেশ, তাই ভাল।

এমন সময় টম পাড়ের দিকে মুখ করে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে কেউ কিছু দেখতে পেল না। সুভাষ বলল—টম, চুপ কর্।

টম কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বরুণ পাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল—অরুণদা, ঝোপের ভেতরটা কেমন নড়ছে যেন। ঐ দেখো—

সত্যি, পাড়ের একদিকের ঝোপ বেশ নড়ছে। সবাই তাকিয়ে রইল সেদিকে। অরুণ বলল—এগুলো সেই খরগোশদের কান্ডকারখানা। এই দ্বীপটাই তো খরগোশের

দ্বীপ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ভেজা কাগজটা এখানে শুকাতে থাক। চলো আমরা জাহাজের নানা দিক ভাল করে দেখি।—এই বলে কাগজের ওপর একটা লোহার টুকরা চাপা দিল সুভাষ। টর্চটা হাতে নিয়ে সবাইকে এগোবার নির্দেশ দিল।

অরুণ বলল—জাহাজের ওপরটা মোটামুটি আমাদের দেখা হয়ে গেছে। এবার চলো ইঞ্জিনঘরটা দেখি। সোনার বাট ওখানেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব। দাদু লিখেছিলেন, 'ঝড়ে ডুবে গেল জাহাজটা।' হয়তো ক্ষতির অনুমানটা ঐ জন্যই করেছিলেন।

লোহার মই বেয়ে ইঞ্জিনঘরে নামতে হয়। টর্চটা নিয়ে সুভাষ আগে আগে নামতে লাগল। কিছুদূর নেমেই বলল—ইঞ্জিনঘর যে জলে ভর্তি! এখানে নামা তো সম্ভব নয়।

তা হলে কি হবে? অনেকটা হতাশকণ্ঠেই বলল অরুণ।

সুভাষ বলল—দাঁড়াও, জল সেচবার নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা আছে। আমি আগে নামি।

সুভাষ নিচে নেমে গেল। প্রায় হাঁটু অবধি জল। অবাক হয়ে দেখল সুভাষ, ঘুলঘুলির মতো একটা জায়গা দিয়ে বাইরের একটু আলো উঁকি মারছে। ঐ পথ দিয়েই হয়তো কিছুটা জল বেরিয়ে গেছে। যে জল রয়েছে তাও বের করে দেওয়া দরকার। সুভাষ দেখতে পেল, ইঞ্জিনঘরের একপাশে জড়ানো অবস্থায় রয়েছে লম্বা একটা হোস পাইপ। তাই দেখে সে সবাইকে ডেকে বলল—নেমে এসো। ঐ হোস পাইপ দিয়ে জল বাইরে বের করে দেওয়া যায় কিনা দেখতে হবে।

ধীরে ধীরে সবাই লোহার সরু মই বেয়ে নিচে নেমে গেল। বাকী রইল টম। সে লোহার মইয়ের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ও অভিমানে গজরাতে লাগল—ঘেউ-উ-উ...

স্বপন বলল—তুই ওখানেই থাক্ টম। আমাদের পাহারা দে।

টম স্বপনের কথা বুঝতে পারল। সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এদের কীর্তিকলাপ।

হাঁটু অবধি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বরুণের মাথায় হঠাৎ একটা প্রশ্নের উদয় হলো—ইঞ্জিনঘরে যতটা জল রয়েছে তার বেশ কিছুটা উঁচুতে রয়েছে ঘুলঘুলিটা। বাকী জল কিভাবে বেরিয়ে গেল, সেটাই আশ্চর্য!

অরুণ বলল—আশ্চর্য সবকিছুই। এ নিয়ে মাথা ঘামালে আর চলে না। এখন কাজে লেগে যাও।

ওর কথা শেষ হবার সংগে সংগেই বরুণ বলল—এই যে এখানে একটা হ্যান্ড পাম্প লাগানো রয়েছে দেখছি। এর পাইপ কানেকশনটা খুলে ঠিক করে নিলেই জাহাজের জল বাইরে বার করে দেওয়া যাবে।

যেমন কথা, তেমন কাজ। হ্যান্ড পাম্প আর হোস পাইপ দিয়ে জল প্রায় সবটাই বাইরে বের করে দেওয়া হলো। তলায় রইল শুধু পায়ের পাতা-ডোবা ময়লা জল।

অরুণ বলল, এখানে তো গুপ্তধন থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

সুভাষ বলল—ছাইয়ের ভেতর যদি সোনা থাকতে পারে তবে ইঞ্জিনঘরের ভেতর থাকতে বাধা কি! খুঁজতে হবে ভাল করে।

একধারে কয়লা রাখার জায়গা। সেখানে অনেক কয়লা রয়েছে। তা ছাড়াও কিছু কয়লা ছিটিয়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে। টর্চ জেলে তন্নতন্ন করে সব দেখা হতে লাগল।

স্বপন সেই কয়লার ঘরের পাশেই আবিষ্কার করল একটি ছোট্ট ঘর। দরজাটা টানতেই খুলে গেল। কিন্তু ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ভ্যাপসা গন্ধ।

ইস্, কি গন্ধ! বন্ধ করে দে! বন্ধ করে দে!—সবাই নাকে হাত চাপা দিল।

কিন্তু দরজা বন্ধ করার কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না। হুড়মুড় করে অনেক জিনিসপত্র এসে পড়ল দরজার ওপর। নানারকম জিনিস। কোনটা ফেলে কোনটাকে সামলাবে ঠিক করতে পারল না স্বপন। কৌতূহলী হয়ে সবাই দেখতে লাগল। ছোট ছোট বাক্স এবং বড় বড় কৌটো আছে কতগুলি। সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি গেল সবার।

এদিকে টম ভয়ানক জ্বালাতন শুরু করল। ঘেউ ঘেউ করে সে একবার ছুটে যায়, আবার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসে। দু'তিনবার ওরকম করতেই সুভাষ ধমক দিয়ে বলল—আঃ, জ্বালাস নে টম, আমাদের কাজ করতে দে।

কিন্তু টম থামল না। এদিকে অরুণ, বরুণ ও স্বপন বাক্স ও কৌটোগুলি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুভাষ একটা লোহার রড দিয়ে ঘরের ভিতরটা নেড়ে দেখতে লাগল আর কি কি জিনিস আছে। ভ্যাপসা গন্ধটা তখন কমে গেছে অনেক।

টমের চেঁচানি কিন্তু মোটেই কমল না। সে একবার ওদিকে আর একবার এদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

সুভাষ বলল—দ্যাখ্ তো বরুণ, টমটা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?

বরুণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। কিছুটা উপরে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল—শীগগির এসো—শীগগির—

কেন, কি হলো আবার? হুড়মুড় করে সবাই এগিয়ে এল সিঁড়ির দিকে। বরুণ ততক্ষণে উপরে উঠে পড়েছে। সুভাষও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। উপরে উঠেই তার যা চোখে পড়ল তা অভাবনীয়। একটা অচেনা লোক ছুটে জাহাজের ডেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কি যেন গুঁজছে প্যান্টের পকেটে। বরুণ ও সুভাষকে দেখেই সে জলে লাফ দিয়ে পড়ল। শব্দ হলো—ঝপাং!

সবাই উপরে উঠে এই ব্যাপার দেখে হতভম্ব! তাড়াতাড়ি তারা ডেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল—একটা লোক সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে যাচ্ছে।

অরুণ বলল—একি, যে কাগজখানা শুকোতে দেওয়া

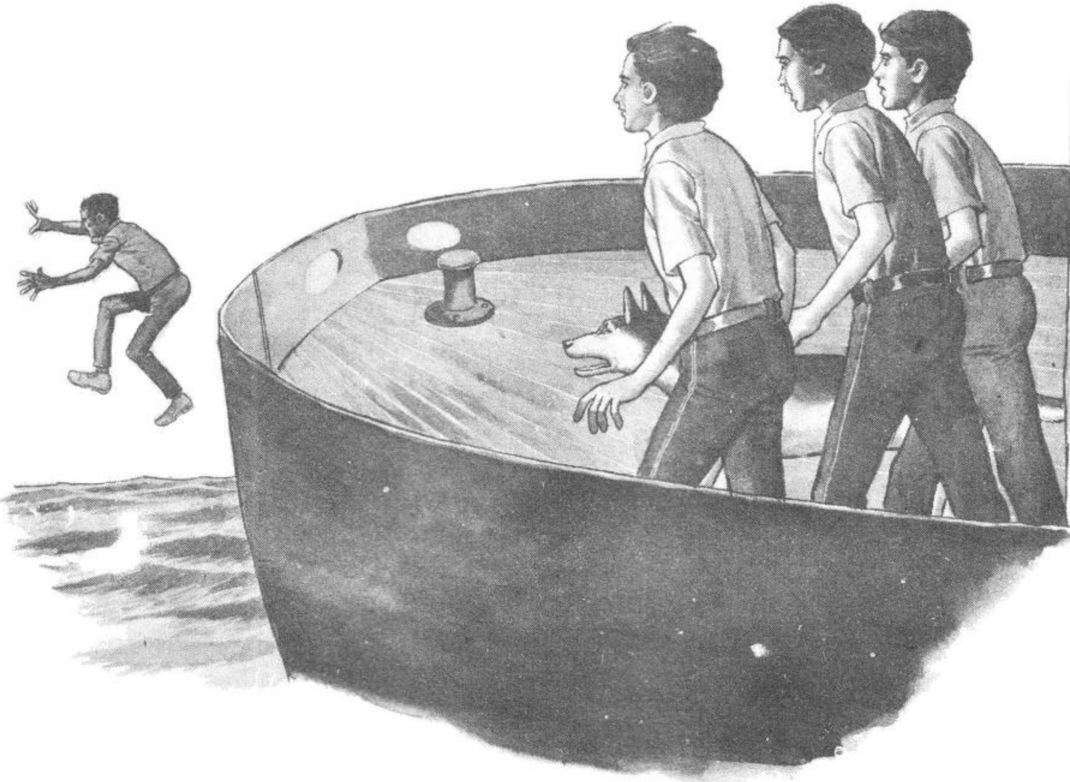

লোকটা জলে লাফ দিয়ে পড়ল।

হয়েছিল, সেটা কোথায় ?

সবাই দেখল, কাগজখানা নেই। চাপা দেওয়া লোহার টুকরোটা শুধু পড়ে আছে।

সুভাষ বলল—সর্বনাশ হয়েছে। সেই কাগজটা নিয়ে পালিয়েছে লোকটা। ওকে ধরতে হবে। সংগে সংগে সে জলে লাফ দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

অরুণ বাধা দিয়ে বলল—না, ঝাঁপ দিস না। বিপদ ঘটতে পারে। লোকটার সংগে হয়তো কোনো অস্ত্র আছে।

সবাই অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখল লোকটা সাঁতার কেটে পাড়ে গিয়ে উঠল। তারপর জাহাজের দিকে তাকিয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঝোপ-জংগলের মধ্যে।

কিছুক্ষণ আগে ঝোপের ভেতর নড়াচড়া দেখে টম যে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল, সেটা তা হলে খরগোশের কোনো ব্যাপার নয়, এই লোকটারই কান্ড।

এই নির্জন দ্বীপে লোক কোত্থেকে এল ? কাল সারারাত এখানে বাস করেও তো কোনো লোকের অস্তিত্ব তারা টের পায়নি। তাহলে ?

কোত্থেকে এল এই লোক ? কেনই বা এল ? আর এই দলিলটাই বা চুরি করল কেন ?

নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো রহস্য আছে। আর আছে কোনো ষড়যন্ত্র। লোকটি হয়তো একা নয়—তার সংগে আরও লোক আছে। তারা নিশ্চয়ই ভাল লোক নয়। হয় গুপ্তচর, না হয় ডাকাত।

সকলেই খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কোন বিপদের বেড়াজালে তারা জড়িয়ে পড়ল কে জানে ? হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

তবু সবার মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল—গুপ্তধন কোথায় আছে ? জাহাজে, না দ্বীপে ? যে কাগজটি তারা কিছুক্ষণ মাত্র দেখেছিল, তাতে যে ছবি আঁকা ছিল, সেই ছবির সংগে নিচের ইঞ্জিনঘরটার কিছু সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু সিঁড়িটা যেমন ঘোরানোভাবে আঁকা ছিল—ঐ সিঁড়িটা তেমন নয়।

তা হলে কি ঐ দ্বীপেই গুপ্তধন রয়েছে ? ঐ দ্বীপে তো একটি মাত্র ঘর। ঐ ঘরের নিচে কোনো গুপ্ত কুঠুরি আছে বলে তো মনে হয় না। তা হলে কোথায় সেই গুপ্তধন ?

ঐ লোকটা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের খোঁজে এসেছে। নইলে এমনভাবে কাগজটা চুরি করল কেন ? ঐ কাগজের মধ্যেই হয়তো রয়েছে কোনো সংকেত। এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাতে পেয়েও তারা হারাল। কাল পর্যন্তও তাদের কোনো শত্রু ছিল না। কিন্তু আজ তাদের পেছনে শত্রু এসে দাঁড়িয়েছে। বিপদ যে কোনো সময়েই ঘটতে পারে।

ছয়

জাহাজের ডেকে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল

অনেকক্ষণ। বসে বসে ভাবতে লাগল এখন কি করবে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল যেন অনেকটা কমে গেল। যে পাড়টা এই জাহাজ থেকে অনেক দূরে মনে হচ্ছিল সেটা যেন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

সুভাষ বলল—ডাঙা বেশি দূরে নয়। আমরা হয়তো এবার না সাঁতরিয়েই পাড়ে গিয়ে উঠতে পারব।

অরুণ বলল, জাহাজ থেকে নামাই তো ঝামেলা। আবার সেই কাছি বেয়ে ঝুলে ঝুলে নামতে হবে।

সুভাষ বলল, না, আর সেভাবে ঝুলে নামতে হবে না। আমি নিচের ঘরে একটা শক্ত দড়ির মই দেখেছি। ওটাই জাহাজের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে নিচে নামব আমরা। জলটুকু পার হলেই তো ডাঙা।

স্বপন বলল, বিস্কুটের টিন দুটো নিয়ে যাবে না?

সুভাষ বলল, হ্যাঁ। শুধু বিস্কুটের টিনই নয়, মোটা দড়ি, লোহার কিছু যন্ত্রপাতি এবং টুকটাক কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হবে। এই নির্জন দ্বীপে সেগুলিই হবে আমাদের সহায়।

অনেক কিছু জিনিস যোগাড় করা হলো। সুভাষ বলল, আপাতত এগুলো ঐ কুঠিঘরে নিয়ে জড়ো করি। ওটাই হবে আমাদের আস্তানা।

তাই করা হলো। জীর্ণ কুঠিঘরের মেঝেতে গিয়ে তোলা হলো সব জিনিস। ঘরের এক কোণ প্রায় ভরে গেল।

সবার মনে নানা দুশ্চিন্তা জড়ো হলেও টমের কিন্তু খুব আনন্দ। সে খোলামেলা জায়গা পেয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল এদিকে ওদিকে। জাহাজে বন্দী হয়ে সে যেন অনেকটা অসহায় বোধ করছিল।

অরুণ বলল—সেই লোকটা হয়তো এই দ্বীপেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

সুভাষ বলল—চল্ একটু ঘুরেফিরে দেখি। শত্রু যখন রয়েছে তখন আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা ঠিক নয়।

অরুণ বলল—তাই বলে খালি হাতে যাওয়াও আমাদের উচিত হবে না।

সুভাষ বলল—ঐ যে লোহার সরু রড রয়েছে, ঐগুলোই আমাদের লাঠির কাজ করবে। তাই হাতে নিয়ে চল্।

লোহার রড হাতে নিয়ে সবাই বের হলো। যেদিক থেকে তাদের নৌকা হারিয়ে গিয়েছিল প্রথমে গেল তারা সেদিকে। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে পৌঁছল তারা। তাকিয়ে দেখল, মাঝদরিয়া দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছে। তাতে দু'তিনজন লোক।

বরুণ বলল—ঐ দেখো একটি কলে চলা নৌকা। ওদের ডাকো না, আমাদের নিয়ে যাক।

সুভাষ, অরুণ সবাই হাত নেড়ে চেঁচিয়ে নৌকার লোকদের ডাকতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য, নৌকাটা এরপর গতিবেগ যেন আরও বাড়িয়ে দিল।

স্বপন বলল—ওরা আমাদের দেখে ভয় পেল নাকি?

বরুণ বলল—সেই লোকটা ঐ নৌকায় করে পালাল না তো?

সুভাষ বলল—হ্যাঁ, তাও হয়তো হতে পারে। কি মতলব নিয়ে পালাল কে জানে! আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

এমন সময় টমের ঘেউ ঘেউ শব্দে সবাই ফিরে তাকাল।

টম কি লক্ষ্য করে যেন ছুটতে শুরু করেছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ঝোপের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপন বলল—টমকে যে আর দেখা যাচ্ছে না। চলো, খুঁজে দেখি।

সবাই ছুটতে ছুটতে সেই ঝোপের কাছে এসে ডাকল—টম, টম!

টমের সাড়া পাওয়া গেল—ঘেউ ঘেউ! কিন্তু তাকে আর চোখে দেখা গেল না।

টমের ডাক অনুসরণ করে সবাই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলতে লাগল। অনেক দূর এগিয়ে গেল। কিন্তু টম কোথায়? কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একপাল খরগোশের পেছনে টম ছুটতে ছুটতে চলেছে।

তারাও ছুটতে লাগল।

আবার এসে গেল সেই কুঠিবাড়ির কাছে। তবে সামনের দিকে নয়, পেছনের দিকে। একটা ভাঙা দেওয়ালের পাশে এসে তারা থমকে দাঁড়াল।

এটাও যে কুঠিবাড়িরই একটা অংশ তা বুঝতে কারুর কষ্ট হলো না। তা হলে এককালে কুঠিবাড়িটি বেশ বড়ই ছিল। অনেক অংশই তার ভেঙে গেছে।

টম হঠাৎ লাফিয়ে দেওয়ালের ওপর উঠে পড়ল, তারপর এক লাফে নেমে গেল ওধারে।

কোথায় গেল টম? এই সময়ে আবার কি খেলা সে শুরু করল?

দেওয়ালটি খুব উঁচু নয়। কৌতূহলী হয়ে সবাই সেই দেওয়াল ডিঙিয়ে ওধারে গিয়ে হাজির হলো। এখানেও সেই খরগোশের দৌরাত্ম্য। টমকে দেখেই খরগোশের কি ছুটোছুটি! দু'তিনটি খরগোশ একটা উঁচু ঢিপির গর্তের মধ্যে ঢুকে পালিয়ে গেল। টমও ছুটে গেল সেই গর্তের সামনে। তারপর ভিতরে ঢুকবার জন্য তার কি আকুলিবিকুলি। কিন্তু ঐ ছোট গর্তের মধ্যে তার বড় দেহটা ঢুকবে কি করে? তখন দু'পায়ের নখ দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল। খুঁড়তে খুঁড়তে বেশ বড় হয়ে গেল গর্তের মুখ। খুব তৎপরতার সঙ্গে টম কাজ করতে লাগল।

কি আশ্চর্য, অনায়াসে টম ঢুকে গেল সেই গর্তের মুখে। স্বপন চেঁচিয়ে উঠল—টম, টম!

সকলেই সেই গর্তের মুখের কাছে এগিয়ে গেল। বরুণ উঁকি দিয়ে দেখল—গর্তটা বেশ বড়, টমকে দেখা যাচ্ছে না। সে বলে উঠল—কোথায় টম! টমকে দেখছি না তো!

সবাই বিস্মিত হলো। কোথায় যাবে টম? খরগোশের গর্ত কি এত বড় হতে পারে?

[চলবে]

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

অঙ্কের আজব ম্যাজিক

যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)
ছবিঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

একবার এক জ্যোতিষ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। সেখানে ভবিষ্যৎবাণীর পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা চলছিলো। চলছিলো তর্ক-বিতর্ক।

হঠাৎই এই বিষয়ে আমার মতামত জানাতে বলা হলো। যিনি আমায় অনুরোধ করেছিলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম......

স্রেফ ম্যাজিক......সত্যিকারের ম্যাজিক দিয়ে।
সে কি? তাহলে আপনি কিভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেন?
ইন্টারেস্টিং...... হাত না দেখে ভবিষ্যৎবাণী?
ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে! দেখান দেখি......
ঠিক আছে, দেখুন তাহলে আপনারা।
এই যে একটা প্যাড...... এর সাহায্যেই দেখাচ্ছি!
এই কাগজটায় আমি একটা কিছু লিখেছি...... দেখেছেন তো?
এটা আপনি দয়া করে রাখুন, যখন বলবো বের করে দেবেন.....
এইবার এই প্যাডে আপনাদের মধ্যে পাঁচজন পরপর পাঁচটা পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা লিখুন দেখি......
হ্যাঁ এইভাবে...... এবার আর একজনকে দিন।
আমি কিন্তু দেখছি না, আপনারা কি লিখছেন......

আপনার হয়েছে? এবার পঞ্চম জনকে দিন।
আমাদের পাঁচজনের লেখা, হয়ে গেছে......
ঠিক আছে......এইবার প্যাডটা আমায় দিন।
এই যে আপনি......হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি...... দয়া করে একটা উপকার করুন না।
অ্যাঁ......আমি? কি করতে হবে বলুন।
এই অংকটা একটু কষে দিন না, তেমন কিছু নয়...... শুধু যোগ করতে হবে
দিন!
এবার অঙ্কের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলুন! শুধু যোগফলটা অন্য কাগজে রেখে দিন।
ঠিক আছে তাই করছি......কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছি।
আচ্ছা এবার যোগফল লেখা কাগজটা দিন ঐ ভদ্রলোককে যাঁকে আমি আগেই একটা কাগজ রাখতে দিয়েছি......
এবার আপনি যোগফল দুটো মিলিয়ে দেখুন তো! আমি আগে যা লিখেছিলাম তার সঙ্গে মিলেছে তো?
!!

কি আশ্চর্য! দুটো কাগজেই যে একই সংখ্যা লেখা। কি করে হলো?
তাজ্জব ব্যাপার!
অবাক কান্ড!
চমৎকার মিঃ সরকার।
দেখলেন তো আমার গণনা কতো নির্ভুল!
ওঁরা সেদিন নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি কিছু বলিনি। তোমাদের চুপি চুপি শিখিয়ে দিচ্ছি। খুব সহজ। কাউকে বোল না কিন্তু!
আমি রাইটিং প্যাডটার পেছন দিকের ভেতরের পৃষ্ঠায় পাঁচ অঙ্কের পাঁচটা সংখ্যা আগেই লিখে রেখেছিলাম।
যোগফলটা সেখানে না লিখে আর একটা কাগজে লিখে প্রথম ভদ্রলোককে রাখতে দিয়েছিলাম।
যে পাঁচজন সংখ্যাগুলো লিখেছিলেন–তাঁরা সামনের পাতায় লিখেছিলেন। তাঁরা জানতেনও না প্যাডের পেছনের কারসাজি।
সকলের লেখা হয়ে গেলে প্যাডটা ডান হাতে নিয়ে হাত বদলের অছিলায় আমি প্যাডটা উল্টে দিই।
ফলে সোজা দিকটা চলে গেলো হাতের নিচে আর আমার লেখা পাতাটা ওপরে এসে গেলো। এই পাতায় লেখা অংকটা কষতে দিই অন্য লোককে। যোগফলটা রেখে
পাতাটা ছিঁড়ে ফেলা হলো। এবার যে ভদ্রলোককে আগে একটা কাগজ রাখতে দিয়েছিলাম তাঁকে কাগজটা বের করে মিলিয়ে দেখতে বললাম। দুটো একই হবে।
তবে যোগের পর নিজের লেখা অঙ্কের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার কথা কিন্তু ভুলে যেও না......

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। নভেম্বর মাসের দুটি বিশেষ দিন কি কি?
২। ভারতের বুলবুল বলা হয় কাকে?
৩। 'মজলিশ' মানে যে জমাট আড্ডা সে তো সবাই জানে। কিন্তু কোন দেশে 'মজলিশ' মানে পার্লামেন্ট?
৪। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাসাদ কোনটি?
৫। শুকতারার দেশ কোনটি?
৬। কোন দেশকে বলা হয় 'সাদা মানুষের কবরখানা'?
৭। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ নাম লাল-বাল-পাল। এঁরা কারা জান তো?
৮। হি-ম্যান, সুপারম্যানদের কমিকসে হামেশাই দেখি ওরা সব লেসার গান, লেসার পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করছে। এই 'লেসার' বলতে কি বোঝায়?
৯। আগুন নেভাতে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
১০। দুধের রং সাদা কেন?

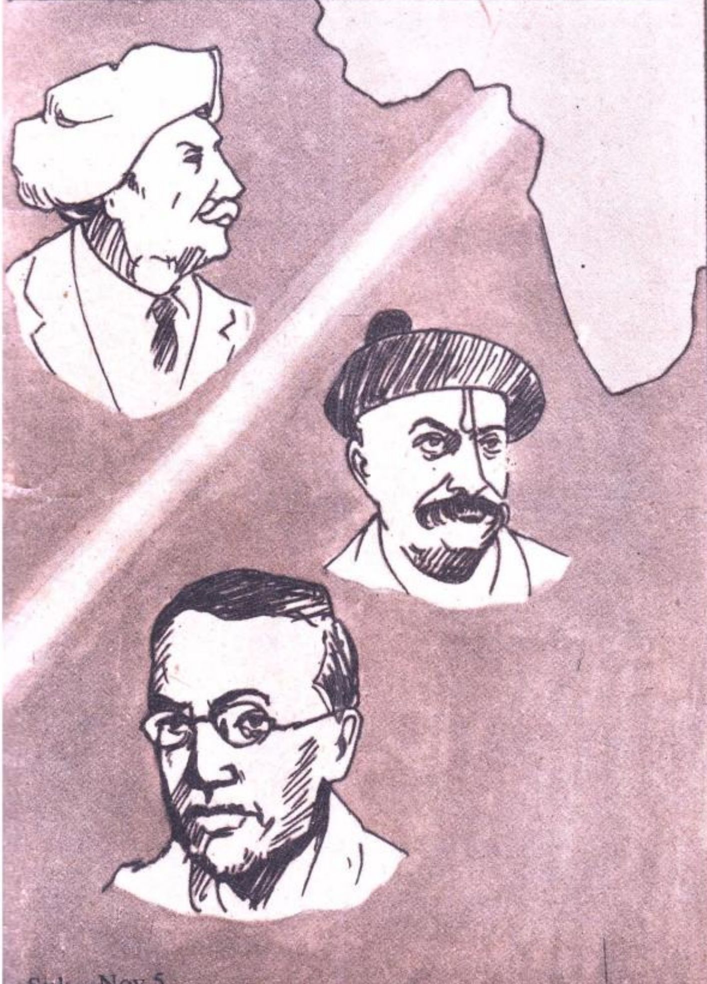

উত্তর ঃ

১। ১৪ নভেম্বর শিশুদিবস, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন; ১৯ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন।
২। সরোজিনী নাইডুকে। তাঁর লেখা কবিতার জন্যে।
৩। ইরান।
৪। পোপের ভ্যাটিকান প্রাসাদ।
৫। কোরিয়া।
৬। আফ্রিকার গিনিকোস্ট।
৭। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল।
৮। লেসার (LASER) বলতে বোঝায় Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. একটি যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একরঙা একটি আলোকরেখা ছাড়া হয়। এই আলোকরেখার তীব্রতা এত বেশি যে নিমেষেই যে কোনো কঠিন পদার্থকে পুড়িয়ে গলিয়ে দিতে পারে। এই সাংঘাতিক শক্তিশালী যন্ত্রকে এখন নানা কাজে লাগানো হচ্ছে। তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র যেমন আছে তেমনি আছে শল্য-চিকিৎসার নানা সরঞ্জাম, বই ছাপার মেশিন ইত্যাদি।
৯। কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
১০। দুধের মধ্যে কেসিন (Caesin) নামক একটি পদার্থ আছে বলে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বিলি হঠাৎ প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণভাগে তীরবেগে ছুটে গেলো

এবার কি করবে বিলি? জানতে পারবে পৌষের শুকতারায়।

বিজ্ঞানের গল্প

রোবট যখন বন্ধু

শান্তনু চক্রবর্তী

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বেজে গেছে; ইলেকট্রনিক অ্যালার্মটাও খানিকক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেছে। তোমার ঘুম তখনও ভাঙেনি। স্কুলে যে যেতে হবে মনেই নেই হয়তো। তোমার বন্ধু 'রোবি' কিন্তু ভোলেনি। ভারী শরীরটা নিয়ে হেলেদুলে ঠিক বিছানার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই তোমার কানের কাছে একটা তীব্র শিসের শব্দ–যতক্ষণ না তোমার ঘুম ভাঙে ততক্ষণ শব্দটা থামল না। জেগে উঠে কিন্তু রোবিকে কাছাকাছি কোথায়ও দেখতে পাবে না। রোবি একটুও সময় নষ্ট করে না, ও এখন চলে গেছে তোমার ব্রেকফাস্ট আনতে। তুমি হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হতে না হতেই ট্রে সাজিয়ে রোবি হাজির! "রোবি আমার হোমটাস্কের অ্যালজেব্রাগুলো সব হয়ে গেছে ?" "সে তো রাতেই, তুমি তখন টি. ভি. দেখছিলে"–সর্দি বসা-বসা খানিকটা ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর এলো, "এবার একটু পড়ায় মন দাও, পরীক্ষার সময় তো আমি থাকব না।" তুমি বোধহয় একটু লজ্জা পেলে, তাড়াহুড়োয় হোমটাস্কের খাতাটাই ভুলে যাচ্ছিলে, রোবি আবার হাত বাড়িয়ে সেটা এগিয়ে দিল। রোবি আসলে কিছুই ভোলে না। তাছাড়া ভুলবেই বা কি করে ? তোমার বন্ধু হলেও ও তো আর মানুষ নয়, 'চতুর্থ প্রজন্ম' বা 'ফোর্থ জেনারেশন'-এর একটি রোবট। আর তুমিও তো এই ১৯৯০-এর লোক নও, ২১৪০-এর দশকে তোমার দিন কাটছে, যখন রোবটেরা মানুষের সবরকম কাজকর্মই শিখে নিয়েছে। মানুষকে তাদের আর প্রায় দরকারই হয় না।

কোনো কল্পবিজ্ঞান লেখক যদি এমনটি লিখতেন তাহলে বোধহয় খুব সহজেই 'একঘেয়ে আজগুবি' বলে পাতা উল্টে যাওয়া যেত। কিন্তু একজন বিখ্যাত রোবট-বিশেষজ্ঞ যখন এসব কথা লিখে ফেলেন, তখন একটু ভাবতে হয় বৈকি! যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়ার 'মোবাইল রোবট ল্যাবরেটরি'-র ডিরেক্টর হান্স মোরাভেক এই কথাগুলো বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। তাঁর মতে আর বছর পঞ্চাশেক অপেক্ষা করতে হবে। আজকের কম্পিউটার ও 'রোবটিক্স' বা রোবট প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে ঐ সময়ের মধ্যেই জ্ঞানবুদ্ধিতে রোবট মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাই বলে রোবট কিন্তু মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে না। বরং সে হবে মানুষের সত্যিকারের বন্ধু, তার আপদ-বিপদ, সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সে হবে মানুষের এমন এক সৃষ্টি যাকে দেখে গর্বে আমাদের বুক ভরে উঠবে। তবে মোরাভেক তাঁর 'মাইন্ড চিল্ড্রেন' বইতে তো একুশ শতাব্দীর রোবট-প্রযুক্তি নিয়েই বেশির ভাগ কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর মানস-পুত্ররাও সবাই চতুর্থ প্রজন্মের রোবট অথচ কম্পিউটারের পাশাপাশি রোবটিক্স নিয়ে গবেষণা চলেছে তো সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। ইতিমধ্যেই তিনটি প্রজন্মের রোবট তৈরি হয়ে গেছে, বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে ফেলেছেন, অনেক কিছুই তাঁদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে, আবার অনেকটাই ভাসাভাসা থেকে গেছে–আর এসব মিলিয়েই তাঁরা একুশ শতকে পৌঁছোতে চাইছেন। একটু ফিরে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখা যাক।

অঙ্ক-বিশারদ রোবট :

তোমরা কেউ 'ম্যাক্সিমা'-র নাম শুনেছ ? তার পোশাকী নামটা অবশ্য বেশ গালভরা–ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালাইজার, ক্যালকুলেটর অ্যান্ড সিম্বল ম্যানিপুলেটর বা সংক্ষেপে 'MACSYMA'। 'ম্যাক্সিমা'র ঠিকানা গণিত বিভাগ ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (যুক্তরাষ্ট্র) আর তার কাজ হলো যত রাজ্যের শক্ত শক্ত ক্যালকুলাস আর অ্যালজেব্রার সমস্যার সমাধান করা। 'ম্যাক্সিমা' জাতিতে প্রথম প্রজন্মের রোবট। ঐ ম্যাসাচুসেটস্-এর আর এক বাসিন্দা হলো 'সিন' (সিম্বলিক ইনটিগ্রেটর)। সেও এক অঙ্ক-বিশারদ। সে নাকি একজন পি. এইচ. ডি. উপাধিধারী গণিতবিদের থেকেও নানারকম প্যাঁচালো অঙ্ক মিলিয়ে দিতে পারে। আসলে রোবট সংক্রান্ত গবেষণা শুরুই হয়েছিল অঙ্কবিদ রোবটদের নিয়ে। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড করপোরেশনের গবেষক-প্রযুক্তিবিদরা পরপর বেশ কয়েকটি রোবট তৈরি করেন, যারা নানাধরনের ছোটখাটো (বেশিরভাগই গাণিতিক) সমস্যার সমাধান করত। এই ধরনের রোবটের নাম দেওয়া হয়েছিল জি. পি. এস. বা 'জেনারেল প্রবলেম সলভার'। এরা সবাই প্রথম প্রজন্মের রোবট। কম্পিউটারের মতোই এদেরও একটি 'স্মৃতি' বা 'মেমরি' ও 'সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট' বা 'কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া বিভাগ' থাকে। এই স্মৃতির কুঠুরিতে আগে থেকেই নির্দিষ্ট তথ্য বা নির্দেশ জমিয়ে রাখা হয়, যাকে বলে 'প্রোগ্রাম'।

প্রসেসিং ইউনিট এই প্রোগ্রাম মেনেই কাজ করে, আর রোবটও নানারকম ভেল্কি দেখায়–এদের কেউ কেউ যেমন 'জেরক্স প্যালোঅল্টো' গবেষণা কেন্দ্রের রোবট স্টুডেন্ট-এর মতো সুবোধ বালক সেজে হাইস্কুল মানের নানারকম অঙ্কের প্রশ্নের উত্তর দেয়; আবার তেমনি এম. আই. টি.-র তৈরি 'এলিজা'র মতো প্রশ্নকর্তাকে বোকাও বানায়। 'এলিজা'-কে যদি জিজ্ঞেস করা হতো অমুক উপপাদ্য বা সমীকরণে অমুক শর্ত বা স্বতঃসিদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তখন সে হেঁয়ালি করে ঘুরিয়ে উত্তর দিত, "এছাড়া ওতে আর কি-ই বা বলা থাকতে পারে ?" বোঝো কি দুষ্টু রোবট !

দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবট-রা অবশ্য অনেক শান্তশিষ্ট। ভালোমানুষ গোছের। তাই বলে তারা মোটেই হাবাগোবা নয়। তাদের বেশির ভাগই কলকারখানায় বা পারমাণবিক চুল্লি বা রিঅ্যাক্টরে কাজ করে। মানুষ শ্রমিককে যেসব কাজ খুব ঝুঁকি নিয়ে করতে হয় বা যেসব কাজ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, সেইরকম সব কাজের ভারই এদের দেওয়া হয়। যেমন প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার জন্য পারমাণবিক চুল্লির যে জায়গায় মানুষ পা-ই রাখতে সাহস পায় না, এইসব রোবট অনায়াসেই সেখানে চলে যায়। বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দেখাশোনা, পরিষ্কার বা ছোটখাটো মেরামতির কাজ সেরে ফিরে আসে– তার জন্য রিঅ্যাক্টরের স্বাভাবিক কাজকর্ম কখনই বন্ধ রাখতে হয় না। রিঅ্যাক্টর ছাড়াও ভারি যন্ত্রপাতি কিংবা মোটর গাড়ি ও জাহাজ-তৈরির কারখানাতেও এই ধরনের রোবটদের দেখা যায়। কোথাও এদের নাম 'রোডার', কোথাও বা 'ম্যানিপুলেটর আর্ম' বা 'যান্ত্রিক হাত'। কাজের ধরন অনুযায়ী এদের মধ্যে কেউ কেউ মোটামুটি হাঁটাচলা করে (অবশ্যই পায়ের জায়গায় চাকা লাগিয়ে), চাপ,তাপ, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভব করতে পারে, আবার টেলিভিশন ক্যামেরা লাগানো চোখে নিজের কাজের এলাকাটা পরিষ্কার দেখতেও পায়। এদেরকে সাধারণত দূর থেকে (রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে) নিয়ন্ত্রণ করা হয়; এমনকি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে দরকার মতো এদের 'প্রোগ্রাম' বা নির্দেশও বদলানো যায়।

একুশ শতকের রোবট :

কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে রোবটিক্স-এর একটা তফাৎ হলো কম্পিউটারের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, নতুন প্রজন্মের কম্পিউটার এসে আগের প্রজন্মকে প্রায় বাতিল করে দিল, রোবটের বেলায় কিন্তু তা হয় না। তাই তৃতীয় প্রজন্মের রোবট বাজারে এসে যাবার পরেও দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে গবেষণার সুযোগ থেকে যায়। সেই কারণেই একদিকে যেমন তৃতীয় প্রজন্মের রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযুক্ত করার চেষ্টা চলছে তেমনি আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবটকে আরো বেশি সংবেদনশীল করে তোলার জন্য সিলিকন চিপের সাহায্যে তাতে রং এমনকি গন্ধের 'অনুভবও' যোগ করার কথা ভাবা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চাকার বদলে ছ'ফুট লম্বা পায়ে চলেফিরে বেড়ানো দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবট 'ওডেক্স' ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ভারি জিনিসপত্র বইবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে তৃতীয় প্রজন্মের রোবটদের কিন্তু অনেক স্মার্ট, বুদ্ধিমান করে তৈরি করা হচ্ছে। তারা যাতে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে, নিজেরাই কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেইভাবেই এদেরকে প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে। আসলে তৃতীয় প্রজন্মের রোবট এখনকার চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সমসাময়িক। গত কয়েক বছরে কম্পিউটারের দুনিয়ায় যেসব ওলটপালট কাণ্ড ঘটে গেছে (মাইক্রোচীপ্, মাইক্রোপ্রসেসর, মালটিপ্রসেসর এইসবের আবিষ্কার) রোবটিক্স-এর গবেষণাতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। বিজ্ঞানীদের সাহসও অনেক বেড়ে গেছে–আগে যেসব ব্যাপার তাঁরা ভাবতেও পারতেন না এখন তাতেই হাত লাগাচ্ছেন। 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স' (সংক্ষেপে এ. আই)-ও এইরকমই একটা বিষয়।

কম্পিউটার বা রোবটরা যতই অঙ্ক কষে বা ধাঁধার উত্তর বলে তাক লাগিয়ে দিক না কেন তাদের ঘটে যে বুদ্ধিশুদ্ধি বেশি নেই প্রোগ্রাম-এর বাইরে মাথা খাটিয়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই, সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কৃত্রিম বুদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণায় এই অবস্থাটাকেই পাল্টাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত যেটুকু এগোনো গেছে তাতে রোবটরা প্রোগ্রামিং-এর নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা ছাড়াও মানুষের মুখের ভাষাও খানিকটা বুঝতে পারছে। এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদের কাজও একটু আধটু করতে পারছে; ম্যাপ, ফটো এসব দেখে বিশ্লেষণ করতে পারছে, হাতের লেখার তফাৎটাও ধরতে পারছে; আর সব থেকে ভালো যেটা পারছে সেটা হলো দাবা খেলা। কিছুদিন আগেই তো একটা দাবাড়ু-কম্পিউটার বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন গ্যারী কাসপারভকেও হারিয়ে দিয়েছে। তবে চতুর্থ প্রজন্মের রোবট বা পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটাররা কিন্তু এইসব সামান্য কাজ করবে না। মোরাভেক তো বলেই দিয়েছেন মানুষের যা অসাধ্য কাজ তাঁর মানসপুত্ররা তাই করে দেখাবে। প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় বা বৃহস্পতি গ্রহের গ্যাসের কুয়াশার মধ্যে–যেখানেই তাদের পাঠানো হোক না কেন তারা সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। পারবে তার কারণ, মানুষের মতোই (বা তার থেকেও বেশি) তাদের চিন্তাশক্তি থাকবে। মানুষের চিন্তাশক্তির উৎস যেমন তার মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষ বা 'নিউরোন', তেমনি এই নতুন রোবটের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া বিভাগেও থাকবে অসংখ্য প্রসেসর একসঙ্গে জুড়ে তৈরি করা একটি প্যারালাল প্রসেসর। এই প্রত্যেকটা প্রসেসরের আবার নিজস্ব 'স্মৃতি বা মেমারি' থাকবে এবং সংযুক্ত অবস্থায় সেটা মানুষের মস্তিষ্কের মতোই একই সময়ে লাখ লাখ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তবে দাবা খেলা বা উপপাদ্য কষার মতো মাথার কাজের চেয়েও রোবটকে নিজে নিজে (রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্য ছাড়া) হাঁটতে বা 'মানুষের চোখে' চাইতে শিখানো যে কত কঠিন তা বিভিন্ন রোবট গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

কেমন দেখতে হবে এই রোবটদের ? যেমন খুশি হতে পারে। মানুষের মতোই (কল্পবিজ্ঞান সিনেমায় যেমন দেখা যায়) দেখতে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। 'স্টার ওয়ার্স' ছবির সেই বিখ্যাত দুই রোবট 'সিথ্রিপিও' বা 'আর টু ডি টু'-র মতো হওয়ারও দরকার নেই। আসলে দেখতে যেমনটিই হোক, তাকে মানুষের বন্ধু হতে হবে; ঠিক রোবির মতো। কিন্তু কথা হলো ঐসব করিৎকর্মা রোবটদের ভিড়ে শেষ পর্যন্ত মোরাভেকের মতো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদরা বেকার হয়ে যাবেন না তো ?

ছবি : সুফি

ত্রয়ীর অভিযান

পরাশর রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী মোটুকে নিয়ে পড়ার ঘরের সামনে এলেন। শশীবাবু পড়ার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে এসেছিলেন। চাবি দিয়ে খুললেন। তিনজনে পড়ার ঘরে ঢুকল।

শশীবাবু মোটু আর শান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন—'যাও চেয়ারে গিয়ে বসো। আমি থানায় ফোন করছি।'

শান্ত বলে উঠল—'আগে আমাদের কথাটা শুনুন। তারপর যা করবার করবেন।'

'ঠিক আছে। বসো।' দু'জনে দুটো চেয়ারে বসল। শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইলেন। শশীবাবু বললেন—'ব্যাপারটা কী? কোন সাহসে এই রাত্তিরে আমার বাড়িতে ঢুকেছো তোমরা?'

'সব বলছি, একটু দম নিতে দিন।' শান্ত বলল।

'ঠিক আছে—' শশীবাবু টেবিল থেকে একটা পুরোনো তেলচিটে নোটবই তুলে নিলেন। বুকপকেট থেকে কলম বের করে বললেন—'তোমাদের নাম-ঠিকানা বলো।'

শান্ত আর মোটু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। শান্ত ভেবে দেখল—ধরা তো পড়েই গেছি। নামধাম না বলতে চাইলে শশীবাবু আরো চটে যাবেন। তখন থানায় ফোন করবেন এবং নির্ঘাৎ বটেশ্বর আসবে। হেনস্তার আর শেষ থাকবে না। শান্ত বলল—'আমার নাম শান্ত—শান্তনু মাইতি আর ও আমার বন্ধু জীমূতবাহন চ্যাটার্জী। আমরা বোসপুকুরে থাকি।'

'গার্জিয়ানের নাম বলো।' শশীবাবু লিখতে লিখতে বললেন।

শশীবাবুর স্ত্রী এবার শান্তদের বাঁচিয়ে দিলেন। বলে উঠলেন—'তুমি কী পুলিশ? এসব জিজ্ঞেস করছো?'

'হুঁ।' শশীবাবু নোটবই বন্ধ করলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন—'তুমি কী করে বুঝলে যে এরা বাড়িতে ঢুকেছে?'

'জানো তো অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাগানে পায়চারি

করি। আজও পায়চারি করছিলাম। জবা ফুলগাছটার আড়াল থেকে দেখলাম ভেজানো দরজা দিয়ে কে বাড়িতে ঢুকল। ওরা দু'জন বুঝিনি। ঠিক পড়ার ঘরে এসে পেলাম। কত দামী কাগজপত্র বই ম্যাপ ছবি–' শান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন–'ওসবই চুরি করতে এসেছিলে–তাই না?'

'না–' শান্ত বলল–'আমরা চুরি বা ডাকাতি করতে আসিনি। আমরা 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'।'

'সে আবার কী?' শশীবাবু ভুরু কোঁচকালেন।

'আমরা কোনো ঘটনার সত্যসন্ধান করি। আপনার এক পাটি জুতো আমরা না বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ফেরৎ দিতে এসেছিলাম। কিন্তু–' শান্ত থামল।

'কোথায় সেই জুতো?'

'বটেশ্বর জোর করে নিয়ে গেছে।' মোটু বলল।

'বটেশ্বর কে?'

'থানার একজন পুলিশ।' মোটু বলল।

'ও বুঝেছি, বুঝেছি–' শশীবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন–'ঐ যে পুলিশটা কয়েকদিন বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিল। দু'দিন তোমার কাছেও এসেছিল। আগড়ুম বাগড়ুম কী সব বলে গেল।'

'হুঁ।' শান্তদের দিকে তাকিয়ে শশীবাবু বললেন–'কিন্তু আমার জুতো নিয়ে এত ঝামেলা কেন?'

শান্ত বেশ গম্ভীর ভংগীতে বলতে লাগল–'কয়েকদিন আগে গগনবাবুর লাইব্রেরী ঘর আগুন লেগে পুড়ে গেছে।'

'এ তো সবাই জানে।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন।

'আমরা সত্যসন্ধান করে দেখেছি–আগুন এমনিতে লাগেনি। কেউ লাগিয়েছে।' শান্ত বলল।

শশীবাবু ও তাঁর স্ত্রী কোনো কথা বললেন না। শান্ত বলতে লাগল–'যে আগুন লাগিয়েছে সে গগনবাবুর বাগানের বেড়ার পাশে সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তার বুটজুতোর ছাপ আমরা পেয়েছি। এখন যাকে যাকে আমরা সন্দেহ করেছি তার তার বুটের ছাপ আমরা নিচ্ছি। আপনার বুটজুতোও সেজন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'বাঃ–ছাপ মিলেছে?' শশীবাবু একটু কৌতুকের সুরে বললেন।

'না–তবে আপনি সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন।' শান্ত বলল।

'কে বলল?' শশীবাবু একটু চমকে বললেন।

'মিলন নস্কর–গগনবাবুর বাজার সরকার মিলন নস্কর। সেও সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। গগনবাবু কলকাতা গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে মিলন ওর দরকারী কয়েকটা জিনিস আনতে গিয়েছিল।''

শশীবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন–'তাহলে সেদিন সত্যিই তুমি গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। সকালে গগনবাবুর সংগে ঝগড়ার সময় দুটো খুব দামী কাগজ ভুলে ফেলে এসেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সে কাগজ দুটো নিয়ে এসেছি। লাইব্রেরী ঘরের ধারেকাছেও আমি যাইনি।' একটু থেমে বললেন–'একটা মাছিও আমি মারতে পারি না। তুমি জানো সে কথা। সেই আমি কারো বাড়িতে আগুন লাগাবো? অসম্ভব।'

'তবু আপনি গিয়েছিলেন!' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।' শশীবাবু বললেন–'এবং কেন গিয়েছিলাম সে কথাও বলেছি। যাক্ গে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো আমি আগুন লাগাইনি আর জানিও না কে আগুন লাগিয়েছে! তবে–' একটু থেমে শশীবাবু বললেন–'গগনবাবু লোকজনের সংগে যেরকম দুর্ব্যবহার করেন–ক্ষেপে গিয়ে তাদেরই কেউ হয়তো আগুন লাগিয়েছে।'

শশীবাবুর স্ত্রী বললেন–'এবার ওদের যেতে দাও–অনেক রাত হয়েছে।'

'হ্যাঁ–' শশীবাবু বললেন–'তোমরা এবার যাও।'

শশীবাবু নিজেই এসে বড় গেট খুলে দিলেন। শান্ত আর মোটু বেরিয়ে এল। মোটুর তখনও ছড়ে-যাওয়া জায়গাটা জ্বালা করছে। তবু মনে আনন্দ–রাতের অভিযানটা বেশ ভালোই হলো। সে-কথা বলল শান্তকে। শান্ত মাথা ঝাঁকাল। মোটু পকেট থেকে চানাচুর বের করল। শান্তকে দিল, নিজেও নিল।

পরদিন বিকেলে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে শান্ত ইজিচেয়ারে বসে আছে। মোটু চেয়ারে। মোটু যথারীতি বাদামভাজা খাচ্ছে। শান্তর একটু বেশি জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। ও আর বাদামভাজা খেল না।

একটু পরেই শেলী এল। ও হাঁপাচ্ছে। বোঝা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। বলল–'কাল রাতে কী হলো বল্!' মোটু ওকে বাদাম দিল। তারপর একে একে গত রাতের অভিযানের কথা বলে গেল। সব শুনে শেলী বলল–'উফ্–খুব বেঁচে গেছিস।' তারপর বলল–'তাহলে দেখা যাচ্ছে যারাই ঐদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে গেছে সকলেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে গেছে। সাহেব বুড়ো গেছে ডিম চুরি করতে, মিলন নস্কর গেছে জিনিসপত্র আনতে, শশীবাবু গেছেন দামী কাগজ দুটো আনতে।'

শান্ত বলল–'শুধু একজন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি–শুধু সংগে গেছে।'

'গীতু–তাই না?' মোটু বলল।

শান্ত মাথা নাড়ল। বলল–'শেলী–তুই এখুনি গীতুর সংগে দেখা করতে যা। গীতুর মা যেন টের না পায়। এর মধ্যে গীতু নিশ্চয়ই কিছু খবর যোগাড় করেছে। সেসব খবর জেনে আয়।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মাছ নিতে হবে যে।' শেলী বলল।

'দরকার নেই। রান্নাঘরে যাবি না। বাইরে কথা বলবি।' শান্ত বলল।

শেলী গগনবাবুর বাড়িতে এল। গেট দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, দেখল গীতু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে কাটা আনাজের খোসা। ও আনাজের খোসা গুলো ড্রেনে ফেলল। তখনই শেলীকে দেখে হাসল। শেলী এগিয়ে এসে

তোমাকে যেন আগে দেখেছি।

বলল–'তোমার মা কোথায়?'

'রান্নাঘরে। ভেতরে আসো না। দবলীকে দেক্‌বে না?' গীতু বলল।

'না–না–' শেলী বলল–'তুমি নতুন কিছু খবর পেলে?'

'হ্যাঁ–মিলনদা চাকরি পেয়েছে। শশীবাবু কত্তাবাবুর সংগে দেখা কত্তি (করতে) এয়েছিলেন।'

ওরা কথা বলছে। লক্ষ্য করেনি যে বাগানের দিক থেকে গগনবাবু ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু দূর থেকেই গগনবাবু হাঁকলেন–'কে ওখানে?'

কর্তাবাবুর সাড়া পেতেই গীতু একলাফে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। শেলীর আর পালানো হলো না। গগনবাবু শেলীকে দেখে চুরুট খেতে খেতে বললেন–'তোমাকে যেন আগে দেখেছি!'

'হ্যাঁ, দেখেছেন। ধবলীর জন্যে মাছ আনতাম। ধবলী আর ওর বাচ্চাগুলোকে আমি ভালোবাসি।' শেলী বলল।

'উঁহু–' গগনবাবু বললেন–'তোমার এখানে আসার অন্য উদ্দেশ্য আছে।'

শেলী চুপ করে রইল।

'তুমি গীতুর কাছে কেন আসো?' চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে গগনবাবু বেশ জোরে বললেন।

শেলী কোনো কথা বলল না।

'গীতু–' গগনবাবু চিৎকার করে ডাকলেন।

শেলী বুঝল এখন চুপ করে থাকলে গীতু বিপদে পড়বে। বেচারীর চাকরিটাও যাবে। গীতু এসে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে ভয়। শেলী বলল–'আপনাকে সব কথা বলছি। কিন্তু কথা দিন গীতুর কোনো ক্ষতি করবেন না?'

'বলো।' গগনবাবু বললেন।

'আমরা 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'।'

'কথাটার মানে?' গগনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন।

'আমরা তিন বন্ধু কোনো ঘটনার সত্য সন্ধান করি। যেমন আপনার লাইব্রেরী ঘরে কী করে আগুন লাগল আমরা তার সত্যসন্ধান করলাম।'

'কী সত্য পেলে?' গগনবাবু মৃদু হেসে বললেন।

'আপনার লাইব্রেরী ঘরে আগুন এমনিতে লাগেনি–কেউ আগুন লাগিয়েছে।'

'এ্যাঁ!' গগনবাবু বেশ চমকালেন।

'যে আগুন লাগিয়েছে সে আপনার বাগানের ওপাশে খাদটায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'ওখানে কাদামাটিতে আমরা তার বুটজুতোর ছাপ পেয়েছি।'

'ইন্টারেস্টিং–ইন্টারেস্টিং–' গগনবাবু বলে উঠলেন।

তারপর বললেন–'সেই বুটজুতোর ছাপ নিয়ে কী করেছো?'

'তিনজনকে আমরা সন্দেহ করেছি।'

'কাকে কাকে?'

'সাহেব বুড়ো, মিলন নস্কর আর শশীশেখরবাবুকে।'

'আহা আগুন তো আমিও লাগাতে পারি?'

'না, পারেন না। এক, আপনি সেদিন কলকাতা গিয়েছিলেন। দুই, আপনি বুটজুতো পরেন না, পাম্পশু পরেন।' শেলী বলল।

'বাঃ বাঃ, তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে! ওদের বুটজুতোর সংগে ছাপ মিলিয়েছো?' গগনবাবু বললেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু কারও জুতোর সংগে ছাপ মেলেনি! তবে শশীবাবুর সব বুটজোড়া এখনও দেখতে পারিনি। আচ্ছা শশীবাবু আজকে আপনার কাছে এসেছিলেন?'

'এ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ।' গগনবাবু একটু চমকে উঠে বললেন।

'কেন এসেছিলেন?' শেলী জিজ্ঞেস করল।

'ইয়ে, একটা বই নিতে। যাক্ গে, বলছিলাম, এসব থানাপুলিশের ব্যাপার। এসব নিয়ে তোমরা বাছারা মাথা ঘামিও না। যাও, বাড়ি যাও।' গগনবাবু বললেন।

'আপনি কিন্তু এসব কথা আর কাউকে বলবেন না।' শেলী বলল।

'বেশ, বেশ।' গগনবাবু গায়ের শালটা ভালো করে জড়িয়ে চলে গেলেন।

[চলবে]

ছবিঃ দিলীপ দাস

বিজ্ঞান সংবাদ

সন্দীপ সেন

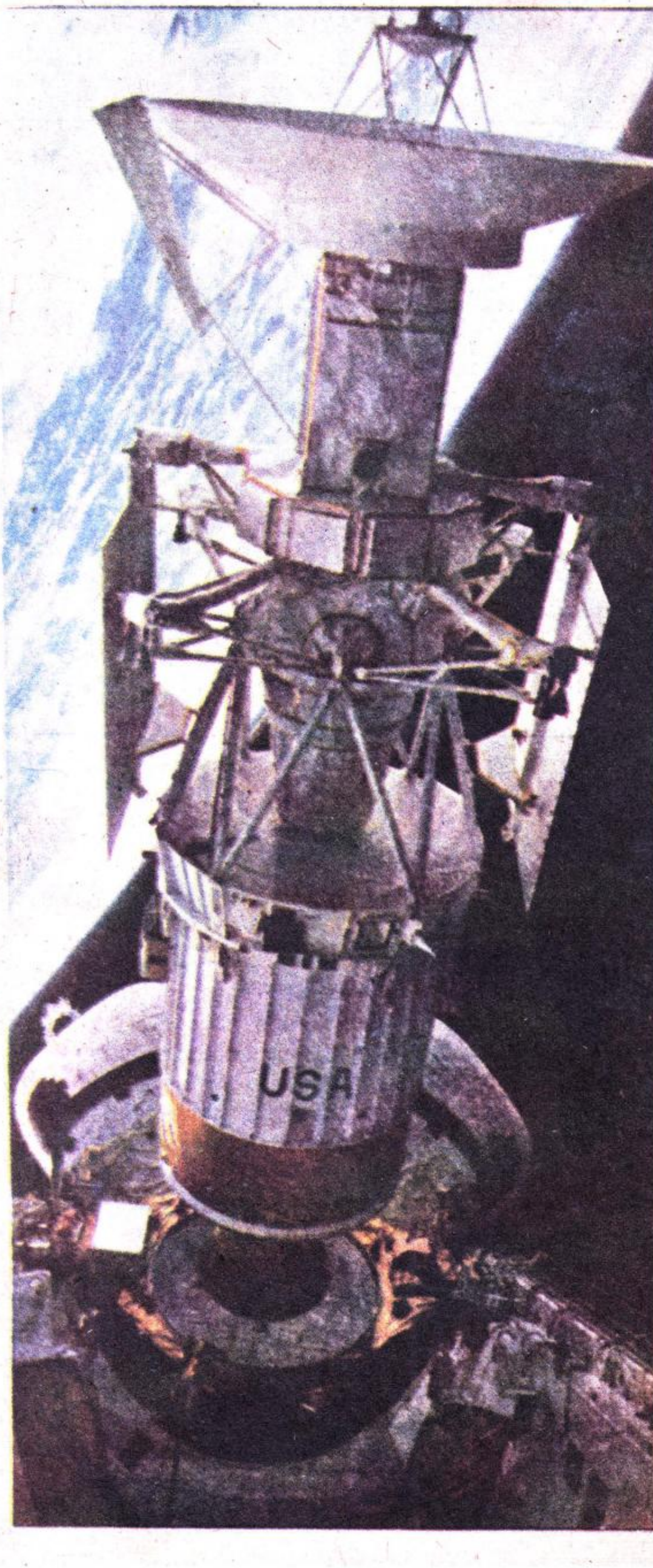

শূক্রে যারা গিয়েছিল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান 'শূক্রে যারা গিয়েছিল' পড়লে বেশ রোমাঞ্চ লাগে। ইচ্ছে হয় চলে যাই সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ শূক্রে। কিন্তু এখনই তো যাওয়া সম্ভব নয়। তবে শূক্রের চারিপাশ পরিক্রমা করেছে পাইওনীয়ার মহাকাশযান। তৈরি করেছে শূক্রের ম্যাপ। পাইওনীয়ার মহাকাশযানের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে শূক্রের ঘনত্ব, আয়তন, ভর মোটামুটি পৃথিবীর মতোই। তবে বায়ুমন্ডল ঘন মেঘে ঢাকা। যে মেঘের স্তর ভেদ করে শূক্রের ভেতর এখনও দেখা সম্ভব হয়নি। পাইওনীয়ার যে ম্যাপ পাঠিয়েছে তাতেও রয়েছে কিছু শূন্যস্থান। শূক্র গ্রহকে ভালোভাবে জানতে এবং ম্যাপ সম্পূর্ণ করার জন্য শূক্রে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ম্যাগেলান। ৩.৪৫ টনের মহাকাশযান নাসার (NASA) প্যাশানীতে এখন ওড়ার জন্য প্রস্তুত। এরপর হয়তো একদিন বাস্তবে পরিণত হবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বপ্ন 'শূক্রে যারা গিয়েছিল'।

চোখের জলে হাসি

মেলবোর্নের সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের মাইক্রোসার্জনরা অসাধ্য সাধন করেছেন। তোমাদেরই মতো ষোল বছরের এক কিশোরের চোখে অশ্রুধারা বহিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তার এটা দরকার ছিল। কারণ তার চোখে কোনো অশ্রুনালী ছিল না। ফলে চোখ ছিল তার শুকনো। ধীরে ধীরে সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটির যখন জন্ম হয় তখনই তার অশ্রুগ্রন্থি এবং চোখের নিচের অংশ ছিল না। এ সবকিছু শল্যচিকিৎসকরা তাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে দিয়েছেন। এখন তাই তার মুখে হাসি।

শব্দ জব্দ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO বোম্বাই বা মুম্বাইকে চিহ্নিত করেছে শব্দদূষণের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় শহর হিসেবে। বিজ্ঞানীরা সতর্কবার্তায় বলেছেন বোম্বাই শহরে শব্দের তীব্রতা গড়ে ৯০ ডেসিবেল হয়ে গেছে। সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৭০ ডেসিবেল তীব্রতাযুক্ত শব্দ আমাদের কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু তার বেশি হলে আমাদের নানারকম ক্ষতি হয়। পরীক্ষাদ্বারা জানা গেছে কোনো মানুষ যদি প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ৮৫ ডেসিবেল তীব্রতাযুক্ত শব্দ বা কোলাহলের মধ্যে থাকে তবে তার মধ্যে বিভিন্ন রোগ এবং আংশিক বধিরতা দেখা দেয়। অতএব বোম্বাই সত্যিই বিপজ্জনক এবং কলকাতা তার পায় কাছাকাছি।

সর্পশাসন

সলিল বসু

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে গ্রামটার বুক চিরে। সদর থেকে তারই পরিদর্শনে আসতে হয়েছে আমাকে। ওভারসিয়ারদের একটা ক্যাম্প যদিও পড়েছে, কিন্তু আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যানের বাড়ি।

সেদিন কাজের শেষে বাইরের ইজিচেয়ারে কর্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে উপভোগ করছি রাতের শোভা। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক, কাছেই কোথাও চলছে ঝিঁঝির একটানা সুর। জোনাকী জ্বলছে গাছপাতার আড়ালে আড়ালে, অজানা ফুলের গন্ধও পাচ্ছি বাতাসে। তারা-ছেটানো আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ।

'ইঞ্জিনীয়ার সাহেব', আচমকা চমক ভাঙে চেয়ারম্যান তনয় রজনীর ডাকে।

'কি ব্যাপার! বস।' আহ্বান জানাই তাকে

'খাবেন চলুন', কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য তার মুখে।

'এখুনি?' বাঁ হাতের কব্জিটার দিকে তাকাই। লিউমিনাস্ পেন্ট দেওয়া কাঁটা দুটো চিক্‌চিক্ করে ওঠে, ন'টা পঁয়ত্রিশ।— 'একটু যাক্ না, সাড়ে দশটা নাগাদ যাবো।'

'কিন্তু আমাদের যে এখুনি একবার বেরোতো হবে।'

'এত রাতে! বেরোতে হবে?'

'হ্যাঁ, রতন মোড়লের ছেলেটা একটু আগে মারা গেছে, সাপের কামড়ে।'

'মারা গেল! আহা। শবযাত্রায় যাবে বুঝি?'

'শবযাত্রায় নয়, সে আবার বেঁচে উঠবে।'

'বেঁচে উঠবে!'

'হ্যাঁ।'

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকি রজনীর দিকে। বলে কি

ছেলেটা! মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠবে!

আমাকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে রজনী বলে, 'বাবা গুরুদেবকে আনতে লোক পাঠিয়েছেন পাশের গ্রামে, মনে হয় বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে পড়বেন।'

'গুরুদেব!' হতভম্ব ভাব কাটিয়ে বলি আমি, 'সাপের ওঝা-টোঝা বুঝি?'

'ঠিক তা নয়, তবে উনি কে; ঠিক বোঝানো যায় না।'

'ও! তা ফি কত? রাত্রে ডবল নিশ্চয়ই?' শেষের দিকে রসিকতা করতে ছাড়ি না আমি। এরা কি সত্যিই বিশ্বাস করে গুরুদেব মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন?

'জানি না আমি', বিরক্তি উপচে পড়ে রজনীর স্বরে।

খেতে খেতেই সাপে কামড়ানোর ঘটনাটা শুনি। কাঠ কাটতে উঠেছিল ছেলেটা একটা গাছে, গাছের উপরই ছিল কেউটেটা। ছোবল মারার আগেই ছেলেটা কাটারির বাড়িতে জখম করে সাপটাকে। যন্ত্রণায় তখন সাপটা এঁকেবেঁকে পাতা ও ডালপাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঘটনাটা জেনে রতন মোড়ল সন্ধ্যেবেলা থেকেই সাবধান হয়ে থাকে। ঘরের দরজা-জানলা, এমনকি নর্দমাগুলোও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হয় না। ছেলের চিৎকারে ঘরে ঢুকে রতন দেখতে পায় একটা কেউটে সাপ একপাশের নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরই সব শেষ।

চেয়ারম্যানের বাড়িতে খবর পৌঁছতে দেরি হয় না। আর তিনিই গুরুদেবকে আনার ব্যবস্থা করেন।

ঘটনাটা শুনে আমার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। রজনীকে বলি, গুরুদেব এলে আমাকে খবর দিতে। তারপর আশ্রয় নিই নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে।

রজনী যখন ঘুম ভাঙাল,রাত তখন সাড়ে বারোটা কি একটা হবে। আঁকাবাঁকা পথে রতন মোড়লের বাড়ি এসে পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগে না। প্রশস্ত উঠোনে ভেঙে পড়েছে গ্রামের যত লোক। মাঝখানে সুতীব্র ডে-লাইট জ্বলছে। ভেতর বাড়ির দাওয়ায় একটা তক্তপোশের উপর মৃত ছেলেটাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত শরীর একেবারে নীল হয়ে গেছে। মুখ ভরে গেছে ফেনায়। খাটটার পাশেই দাওয়াটার উপর একটা বড় পাথরের খোরায় কাঁচা দুধ, কানায় কানায় ভর্তি। উঠোনের একধারে একটা চেয়ারে উপবিষ্ট চেয়ারম্যান স্বয়ং, তাঁর পাশে আর একটা বেতের চেয়ার, কার জন্যে রাখা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আলোর ঠিক পাশে একটা কম্বলের আসনে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। গায়ে একটা সাধারণ চাদর জড়ানো। ভদ্রলোক একটু রোগাটে। প্রশস্ত কপালের এক কোণে একটা বড় কালো আঁচিল। চেহারায় কোনো আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে বলে মনে হলো না। তাঁর পাশে একটা নতুন মাটির হাঁড়ি আর সেটাকে ঢাকা দেবার উপযুক্ত একটা সরাও আছে। সামনে একটা চৌকো ছকমতো কাটা, তার চার কোণায় চারটে কড়ি।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে ভদ্রলোক যেন কি সব বকছেন। হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধতা নেমে আসে জড়ো হওয়া লোকগুলোর মাঝে। ও কি! কড়ি চারটে নড়ছে না? ভাল করে চোখ দুটো কচলে নিই। ভদ্রলোকটিও ততক্ষণে চোখ খুলেছেন। কড়িগুলো শুধু নড়ছে না, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে উঠোনের চারটে কোণায়। আমার বিস্ময় বাড়তে থাকে ক্রমশ। সিগারেটটা অজান্তেই খসে পড়ে হাত থেকে। একটা ঘুরন্ত কড়ি আমার চেয়ারটার তলা দিয়ে চলে যায়। পা দুটো তুলে নিই, আবার নামাই। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়, তারপর দেখি একদিক থেকে একটা কড়ি ফিরে আসছে, যেভাবে গেছল ঠিক সেইভাবেই। আর এসে থেমে গেল চৌকো ছকের একটা কোণায়।

একই ভাবে আর দুটো কড়িও ফিরে এল। শুধু ফিরল না আমার চেয়ারের তলা দিয়ে চলে যাওয়া কড়িটা। ভদ্রলোক ইশারায় চেয়ারম্যানকে কাছে ডাকলেন। তারপর তাঁর নির্দেশমতো এই দিকটা খালি করে সরে যেতে হলো আমাদের। এই দিকেই নাকি বিপদের সংকেত।

এবারে যে পাশে এলুম সেখান থেকে দাওয়াটা বেশ ভালই দেখা যায়। অসম্ভব নিস্তব্ধতা পালন করতে হবে এইবার, আর পালন করেও সবাই। দেখতে দেখতে কিছু সময় কেটে গেল। ওধারে আমার আধপোড়া সিগারেটটা তখনও নেভেনি। ধিকিধিকি করে জ্বলে চলেছে। আর তা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কুন্ডলীর মতো ধোঁয়া। ও কি! ধোঁয়াটা সামনে এগোয় কেন? সোজা হয়ে বসি বেতের চেয়ারটায়। ধোঁয়া নয়, ওধার থেকে যেটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেটা একটা কেউটে আর তার মাথায় আটকানো না-ফেরা কড়িটা। স্বপ্ন নয় তো! প্রাণপণে কামড়ে ধরি বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা। ক্যানাইন্ টুথটা বসে যায় নখটার পাশে, পরক্ষণেই বার করে নিই যন্ত্রণায়। সাপটা ততক্ষণে পৌঁছে যায় দাওয়াটার উপর। তক্তপোশের পায়া বেয়ে একেবারে উঠে যায় ছেলেটার বুকের কাছে, ছোবল মারে সবেগে।

শিউরে উঠি আমি, নখের কোণে তখন রক্ত ঝরতে শুরু করে দিয়েছে। পকেটের রুমালটা দিয়ে জড়িয়ে ফেলি আঙুলটা। সাপটা নেমে আসে, খোরার দুধে মুখ দিয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত। আবার ওঠে খাটে, আবার ছোবল। নেমে আসে, উঠে যায়, আবার নামে। নীলচে হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ দুধটা। ছেলেটার সাধারণ রং ফিরে আসতে থাকে, মুখের ফেনাও আসে মিলিয়ে। তারপর সাপটা একবার খোরায় এসে মুখ দেয়, কড়িটা খসে পড়ে মাথা থেকে। আর ওঠে না। খাটের উপর পাশ ফিরে শোয় ছেলেটা।

পরদিন সকালে গুরুদেবের বিদায়ক্ষণে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, এটা কি আপনার নিজের আবিষ্কার?'

'না না, কি যে বলেন। চাষ করে ফেরার পথে একদিন এক তৃষ্ণার্ত সাধু আমার কাছে জল চান। তাঁকে আমি খাওয়াই ডাব, আর তিনিই আমায় দেন এই মন্ত্র। এটা যে কি করে হয় তা কিন্তু আমি জানি না। আপনারা দেখলেন তো, কিছু বলে দিতে পারেন আমাকে!' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

সিগারেট ধরাবার অছিলায় আড়াল করার চেষ্টা করি নিজেকে।

ছবি : সরোজ সরকার

বাঘের মুখোমুখি

পরেশ দত্ত

বর্ষায় প্রলয়ঙ্করী কোশীর ভয়ঙ্কর বন্যায় ভাঙতে শুরু করেছে রায়শিরি। প্রবল বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে এককালের জমজমাট জনপদ। ভেঙে পড়েছে মহাজনদের কোঠা দালান, বড় বড় মন্দির। নদীর একদিকের পুরনো গ্রাম, চাষের ক্ষেত ধ্বংস হয়ে গড়ে উঠেছে জংগল, বালুচর। ওখানে তখন বাঘ, গন্ডার, বুনো মোষের বাস।

ভারতে তখন পুরোপুরি ইংরেজ রাজত্ব।

কোশীর দুরন্ত বন্যার সংগে পাল্লা দিতে না পেরে রায়শিরির কয়েকটি পরিবার নদীর খাত থেকে অনেক দূরে নতুন করে ঘর বেঁধেছে। গ্রামের আশপাশে গোচারণভূমি, চাষের ক্ষেত, ঝোপজংগল। ঘন বাঁশের দুর্ভেদ্য জংগল। বন্যার পরে এখনো টিকে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশাল মন্দির। এককালে মন্দিরে অনেক পুণ্যার্থীর সমাগম হতো।

এইসব পোড়ো গ্রামে প্রায়ই বাঘের উপদ্রব হয়। বেশ কিছু লোক বাঘের পেটে যাবার পর রায়শিরির মানুষজন দারুণ আতংকে দিন কাটাচ্ছে। গ্রামের কারুর কাছেই বন্দুক নেই।

গ্রামে খবর এলো দুটি ইংরেজ তরুণ হরিণ শিকারে এসেছে। নতুন শিকারী, জংগল হাঁকাও করার জন্য তাদের সংগে কিছু লোকজনও রয়েছে।

ছেলে দুটির একজনের নাম জো, আর তার ভাইয়ের নাম জর্জ। কারুরই শিকারে তেমন অভিজ্ঞতা নেই। তবে সংগে আছে কয়েকটা শিকারী হাতি। সারাদিন শিকারে তাদের তেমন কিছু জোটেনি। ফিরে যাবার মুখে গ্রামের লোকের কাছে বাঘের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল জো আর জর্জ। বাঘ শিকারের এমন সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চায় না। বন্যার পর নদীতে তখন জল কম। শিকারীরা চটপট হাতিগুলোকে সাঁতার দিয়ে এপারে গ্রামের দিকে নিয়ে এলো।

জো আর জর্জ দেখল গ্রামের আশপাশে অনেক কাঁটা ঝোপ। কিন্তু তেমন কোনো বড় জংগল নেই। তবুও বাঘ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে এমন কয়েকটা জংগল হাঁকাও করাল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। ভাবল গ্রামের লোক ওদের ভাঁওতা দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে তারা সেদিনের মতো হাল ছেড়ে দিল। গ্রামের আশেপাশে ঘুরে দু-ভাই কয়েকটা বড় দীঘি ও ডোবা দেখল। দীঘির কাছাকাছি একটা শিমুল গাছ। বাঁশের ঘন জংগল। ঝোপের ভেতর দিয়ে দেখা যায় জীর্ণ ধূসর মন্দিরের চূড়া। পোড়ো মন্দিরের গায়ে বড় বড় ফাটল। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল, মরচে ধরে বেঁকেচুরে মন্দিরের ছাদের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। মন্দিরের ইটের গাঁথুনির ভেতর লতা গজিয়েছে। শেকড় ছড়িয়েছে বড় বড় পাতাওয়ালা পিপুলগাছ।

মন্দিরের ভিতরটা গুহার মতো অন্ধকার। নিচে স্যাঁৎসেঁতে মাটি। মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে ওদের একটা হাতির পা মাটিতে দেবে গেল। মন্দিরে ঢোকার পথে ঝোপঝাড় এমন জড়াজড়ি করে রয়েছে যে অন্ধকারে কিছুই নজর করা যায় না। জো আঁচ করল জংগলে ঢাকা মন্দিরের ভেতর বাঘ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

জর্জের হাতির মাহুত আচমকা ওদের দেখাল একটা গাছের ডালে বাঘের নখের আঁচড়। কিন্তু দু-ভাই গাছে নখের দাগ দেখেও বিশ্বাস করতে পারল না কাছাকাছি বাঘ আছে। কারণ নখের দাগ মাটি থেকে প্রায় এগারো ফুট উঁচুতে। তারা ভাবতেও পারছে না বাঘ অত উঁচুতে উঠতে পারে। জো ঠিক করল ব্যাপারটা যাচিয়ে দেখতে হবে, কাছাকাছি সত্যি কোনো বাঘ আছে কিনা।

হাতির পিঠ থেকে মাটিতে নেমে এলো জো। গাছের গুঁড়ির দিকে যাবার জন্য ঘন লতাপাতার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। সংগে গুলিভরা ভারি টমাস্ পেটেন্ট পিস্তল। বেশ জোরে চার্জ করার শক্তি রাখে।

প্রায় কিছু না দেখেই সামনে এগিয়ে গেল জো। কিছুটা এগিয়ে একটা পুকুরের পাড় দেখতে পেল সে। সামনে ফের গাছের জটলা। ডালপালা সরিয়ে পা বাড়াল জো। কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল ভিজে মাটিতে বাঘের থাবার দাগ। জো এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল গাছের উঁচু ডালে সত্যিই বাঘের নখের আঁচড় দেখেছে। গাছের ছালে বাঘ থাবার নখ পরিষ্কার করেছে। খুব তাজা দাগ। গাছের গায়ে দুধের মতো

সাদা রস তখনো শুকিয়ে যায়নি। বাঘ খুব কাছেই কোথাও রয়েছে—ভাবতে বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল জো'র।

চারিদিকে ঝট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল জো। পুকুরের ধারে বাঘের সদ্য পায়ের দাগ। পুকুরের জলে নামার সময় বাঘের কিছুটা পা হড়কে গেছিল। পুকুরের জল তখনো ঘোলা হয়ে রয়েছে। বাঘ কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। ভাবতে রক্ত হিম হয়ে গেল জো'র।

দারুণ গরম, গুমোট। চারিদিক থমথমে। গলগল করে ঘাম হচ্ছে জো'র। চেঁচিয়ে জর্জকে জানাল, বাঘের হদিস পেয়েছে। বাঘের খাবার তাজা দাগ দেখেছে। জো তখনো বুঝতে পারছে না বাঘ ঠিক কতটা দূরে রয়েছে।

জো'র কথার উত্তরে জর্জ জিগ্যেস করল, কাছাকাছি কোথাও বাঘের মড়ি পড়ে রয়েছে কিনা! জো জানাল, বাঘ এখনো দেখতে পায়নি। বাঘের খোঁজে সে আরো ভেতরে যাচ্ছে।

মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে, লতাঝোপ কেটে জো ভেতরে এগিয়ে গেল। হাতে ছুরি, কোমরের বেল্টে গুলিভরা পিস্তল। সামনে বিশ্রী, ঘুপচি ঝোপ। কাঁটায় জো'র সারাদেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। জো তখন জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে এগিয়ে গেছে। হাতির শব্দ, লোকজনের কথাবার্তা তখন আর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার আরো গাঢ় হচ্ছে। জো জানে না কোথায় গিয়ে পড়বে। সারা শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি বোধ করল।

আচমকা কি একটা অজানা শব্দে জো'র বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। শুনল সামনে একটা বড় জানোয়ার চুপিসাড়ে ঝোপ ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। জো'র শিরদাঁড়া বেয়ে তুষারস্রোত নামল। চলকে উঠল বুকের রক্ত। সে তখন নিজের হৃদ্‌পিন্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তবে তখনো ঝোপের কাছাকাছি বাঘের লুকিয়ে থাকার কথা ভাবতে পারছে না। শুনেছে রায়শিরির মন্দিরে ভূতপ্রেত আছে, প্রেতেরা দেবতার ধনসম্পদ পাহারা দেয়।

মন্দিরের সীমানায় ঢুকে গেল জো। আশেপাশে দেখতে পাচ্ছে পাথরের শিল্পকর্ম। ভারি দেয়াল থেকে মোটা কাঠের চৌকাঠ ঝুলে পড়েছে। দরজার বড়বড় পাল্লা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। গাছের জটলা ভেদ করে ভেতরে বাতাস ঢোকে না। পুরনো নিচু দেয়াল। পাথর খসে নিচে ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের আশপাশের চত্বর ঝোপজঙ্গলে ঢেকে গেছে। সব ক'টা পাথরের ফাটল থেকে ঝোপ মাথা তুলেছে। সবুজ শ্যাওলায় ঢেকে গেছে ইট-পাথর। চারদিকে ধ্বংসের ছবি। জো ভাবল এমন ভূতুড়ে জায়গায় কেউ বাস করতে পারে না।

জো দাঁড়িয়ে উঠে গা থেকে শুকনো পাতা ধুলো ঝেড়ে ফেলল। চমকে উঠে দেখল একটা শেয়াল নিঃশব্দে সরে পড়ছে। শিয়ালটা বেরিয়ে এলো একটা ভাঙা দেয়ালের ফাঁক থেকে। বিকটদর্শন একটা গোসাপ সরসর করে সরে গেল। বড় বড় কানওয়ালা বাদুড় কালো ডানা ঝাপটে জো'র মাথার ওপর উড়তে লাগল। ডানায় হিসহিস শব্দ তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জো জীবনে কখনো এমন ভয়ানক অবস্থায় পড়েনি। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবছে কখন এই নরকের গহ্বর থেকে বেরুতে পারবে।

তিন চুড়োওয়ালা মন্দির। কোশীর আশপাশের লোকালয়ে এই ধরনের মন্দিরই দেখা যায়। প্রথমে একটা নিচু চুড়ো। খুব নিচু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভেতরে মাঝামাঝি একটা চৌকোণা ঘর বড় চুড়োর নিচে। একটা কালো পাথর ঘিরে নালা। কিছুটা দূরে বেদীর ওপর পাষাণমূর্তি।

মন্দিরের ভেতর উঁকি দিল জো। ফাটল ও ভাঙাচোরা ভারি দেয়ালের চোরাপথে আবছা আলো মন্দিরের ভেতর নেমে এসেছে। ধনুকের মতো বাঁকা খিলান, উঁচু খোলা ছাদ। সামান্য শব্দও এখানে গমগম করে ওঠে। চুড়োর নিচে বাদুড়ের দল পাক দিয়ে ডানা মেলে উড়ছে। ডানা ঝাপটানোর হিসহিস শব্দ কানে আসছে। দু-একটা বাদুড় মাঝে মাঝে জো'র মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে। ভয়ে বারবার পেছিয়ে গেল জো।

নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন মন্দিরের ভেতর কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। জো দেখল মন্দিরের শেষ প্রান্তে আবছা খিলানের ওদিকের অন্ধকারে মণির মতো কী যেন জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। স্ফুলিঙ্গের মতো ঝকঝক করছে—দেয়ালে আঁটা চুমকির মতো। জিনিসটা কী জো ঠিক বুঝতে পারছে না। আসল রত্নও হতে পারে।

চকচকে জিনিসটা কী তা দেখা দরকার। জো মন্দিরের ভেতর থেকে মাথা টেনে নিল, তারপর যতদূর সম্ভব জোরে গলা তুলে চেঁচিয়ে জর্জকে ডেকে দেশলাই দিয়ে কারুকে পাঠাতে বলল, যাতে ভাঙা মন্দিরের ভেতরটা ভালো করে দেখা যায়।

জো'র চিৎকার নিস্তব্ধ মন্দিরের প্রকান্ড চুড়োর নিচে বারবার গমগম করে উঠল। আর ঠিক তখনই একটা জোরালো হিসহিস শব্দ জো'র কানে গেল। রাগী বেড়ালের ফ্যাঁসফেসে শব্দের মতো। বাদুড়ের ডানার শব্দও হতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না জো।

ওদিক থেকে জর্জের সাড়া পাওয়া গেল। জো'র মনে হলো জর্জ তার দিকে আসার চেষ্টা করছে কাঁটাঝোপ ঠেলে। কিন্তু এগিয়ে আসতে না পেরে বারবার থেমে যাচ্ছে। জো ফের চেঁচিয়ে ডাকল জর্জকে। ঠিক তখনই ফের মন্দিরের ভেতর শোনা গেল ঘড়ঘড়, ফোঁস ফোঁস শব্দ।

জো শুনল জর্জ বাঁশের বেড়াজালের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ওই কাঁটাঝোপ ঠেলেই জো মন্দিরের ভেতর ঢুকেছিল।

জো অধৈর্য হয়ে পড়ল, ভাবল জর্জ আসতে এত দেরি করছে কেন! মন্দিরের ভেতর দিকে ফের উঁকি দিল জো। ঠিক তখনই হকচকিয়ে দেখল আগুনের গোলার মতো ঝুলছে দুটো ঝকঝকে সবুজ আলো। স্ফুলিঙ্গের মতো একবার জ্বলছে, আবার নিভছে। মনে হচ্ছে হীরের ওপর আলো ঠিকরে পড়েছে। জো হতবাক—কীসের আলো ওই দুটো! জো দেখল জহরত দুটির আলো ক্রমে আরো উজ্জ্বল হচ্ছে। আরো বেশি আলো ছড়াচ্ছে।

জো মাথা নিচু করে মন্দিরের ভেতর ঢুকল। বদ্ধ বাতাস। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন হাঁ করে গিলে ফেলল তাকে। আরো ভেতরে ঢুকল জো। বাদুড়ের দল ফের

মাথার ওপর উড়তে লাগল। জো বড় চূড়োর ঠিক নিচে গিয়ে দাঁড়াল। অজানা অচেনা জায়গা। সামনে কিছুই নজর চলে না। অন্ধের মতো দুহাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে এগোল জো।

'আঁ–উ–উম!' বাঘের আচমকা ভয়ংকর গর্জনে মন্দিরের সমস্ত দেয়াল যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। চূড়োর নিচে বার বার গমগম করে উঠল সেই গর্জন।

জো দেখল রত্ন দুটো এখন আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। জো'র মনে হলো তার হৃদ্‌পিন্ড যেন কে প্রকান্ড হাতে মুচড়ে ধরেছে। জো এবার স্পষ্ট বুঝল, সে এখন একটা ভয়ংকর শ্বাপদের সঙ্গে একই চূড়োর নিচে বন্দী হয়েছে মরণফাঁদে। পালাবার কোনো পথ নেই। এখন শুধু জো আর তার সামনে একটা নরখাদক বাঘ।

পিস্তলের নল ঝলসে উঠল

ভাববার সময় নেই। জো এমন বিপদে খুব কমই পড়েছে। জো বুঝল ভয়ংকর জানোয়ারটা মন্দিরের আরো ভেতর দিকে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, যাতে তাকে সহজে খুঁজে না পাওয়া যায়। বাঘটা সামনাসামনি লড়াই করার চাইতে আড়ালে গা ঢাকা দিতে চাইছে। কিন্তু জানোয়ারটার পালাবার পথ নেই। তাই আরো হিংস্র, আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে। জো বুঝল বাঘটা এবার তার ঘাড়ে লাফাবার উদ্যোগ করছে। জো মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

আচমকা বাঘের ভয়ংকর গর্জনে কানে তালা ধরে গেল জো'র। আর ঠিক তখনই একটা বিশাল দেহ জো'র মাথার ওপর দিয়ে প্রবলবেগে লাফিয়ে চলে গেল। জো তখন আর কিছু স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না। হঠাৎ জর্জের আতংকমেশানো চিৎকার শুনল।

জো জোরে ছুটল। ঘনঘন নিঃশ্বাস নিয়ে একটা মোটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। নরখাদকটা বাঘ নয় বাঘিনী। সে তখন মন্দিরের মাঝখানে ছুটোছুটি করছে। বাতাসে ঝাপটা মারছে ল্যাজ আছড়িয়ে। গরগর করে গর্জন করছে ওদের দুজনকে ভয় দেখাবার জন্যে।

জো তখন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। বাইরে থেকে জর্জের গলা শুনতে পাচ্ছে। বাঘিনীও ভয় পেয়েছে। জো'র মুখোমুখি হতে সাহস করছে না।

ভয়ংকর আতঙ্কে জো'র সারাদেহের রক্ত যেন হিম হয়ে গেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন প্রায় থেমে গেছে। নিজের সাহস ফিরিয়ে আনল জো। বুঝতে পারল একটু নড়াচড়া করলে বা কথা বললে বাঘিনী তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জো তখন হাত বাড়িয়ে বাঘকে ছুঁতে পারে। বাঘিনী তখন ভুলে গেছে জো মন্দিরের ভেতর রয়েছে। মন্দিরের মাঝের চূড়োর নিচে অনেকক্ষণ দুরন্ত বেগে ছুটোছুটি করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বসে পড়ল।

জো ভয় পেয়ে জর্জ ও মাহুতকে ডাকাডাকি করতে বাঘিনীর চোখ পড়ে গেল জো'র দিকে। বাঘিনী নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল জো'র দিকে। বাঘিনীর মাথার ওপর তখন একফালি আলো এসে পড়েছে।

খুব ধীরে ধীরে জো পিস্তল তুলে নিল। পিস্তলের হ্যামারের মৃদু শব্দে বাঘিনী রাগে গরগর করে মাথা বাঁকালো। জো বুঝল এমন সুযোগ আর আসবে না। জো'র হাতের পিস্তলের নল ঝলসে উঠল। পরপর দুবার। পিস্তলের বিকট আওয়াজ চূড়োর নিচে গমগম করে উঠল। কিন্তু বাঘিনী আর গর্জন করল না। মাথা তুলল না। প্রথম গুলিটা সোজাসুজি তার মাথার ভেতর ঢুকে গেছে।

মন্দিরের প্রবেশ পথের বনজঙ্গল কেটে বাঘিনীকে বাইরে আনা হলো। দেখা গেল বাঘিনী বুড়ি হয়েছে। চর্মরোগগ্রস্ত। প্রায় দন্তহীন। রোগা গায়ে লোম নেই। ফিতের মাপে ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি। এই বাঘিনীই রায়শিরিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

ছবি : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

পিকিং এশিয়াডের পর খেলা নিয়ে কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছেন সেজদাদু। বিল্টু-মণ্টু ওদের গলিতে ব্যাট-বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে তা দেখেও দেখছেন না তিনি। বিল্টু-মণ্টুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সেজদাদু বোধহয় খবরের কাগজের খেলার পাতাটাও আর খুলে দেখেন না। বিল্টুদের বাড়িতে খেলা নিয়ে সব সময় কথাবার্তা হতো, গল্প হতো–সেজদাদুর হাবভাব দেখে এখন কিন্তু সকলেই চুপ। কেউ আর মুখই খুলছেন না। আসলে পিকিং এশিয়াডে শুধুমাত্র কাবাডির সোনা নিয়ে যে ভারতীয় দল দেশে ফিরবে এ কথা কেউ কল্পনাও করেননি। সকলেরই বিশ্বাস ছিল, পি টি উষা ভারতকে একটা-দুটো সোনা নিশ্চয়ই

সেজদাদু রেগে টং

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এনে দেবেন। তাছাড়া টেনিস, গল্ফ, নৌচালনা, ভারোত্তোলন, কুস্তি, শ্যুটিং, তীরন্দাজী, হকি ইত্যাদি থেকে দু-চারটে সোনা ভারত নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু সেই আশা যে দুরাশা ছিল তা কেউ ভাবতেও পারেননি। কল্পনা করেননি বলেই দুঃখটা এতো বেশি। এশীয় ক্রীড়া শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে। মূলত ভারতের চেষ্টাতেই শুরু হয়েছিলো ওলিম্পিকের ধাঁচে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তাই প্রতিযোগিতার প্রথম আসর বসেছিল ভারতের রাজধানী দিল্লীতেই। তারপর এবার নিয়ে এগারোবার বসলো এই প্রতিযোগিতার আসর। কিন্তু এবারের মতো এমন শীর্ণ চেহারা ভারতের আর কখনও ফুটে ওঠেনি। অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক থেকে ভারত সোনা পায়নি এমনও কখনো হয়নি। হকির সোনা ভারত শেষ বার পেয়েছিল চব্বিশ বছর আগে। তারপর থেকে এশিয়াডে হকির সোনা আমরা আর কখনও পাইনি। ১৯৮২ সালে দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ভারত বিশ্রীভাবে পাকিস্তানের কাছে হেরে সোনা হারিয়েছিলো। ১৯৮৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়া টেক্কা দিয়েছিলো ভারত-পাকিস্তানকে। আর এবার ১৯৯০ সালে পিকিংয়ে তীব্র

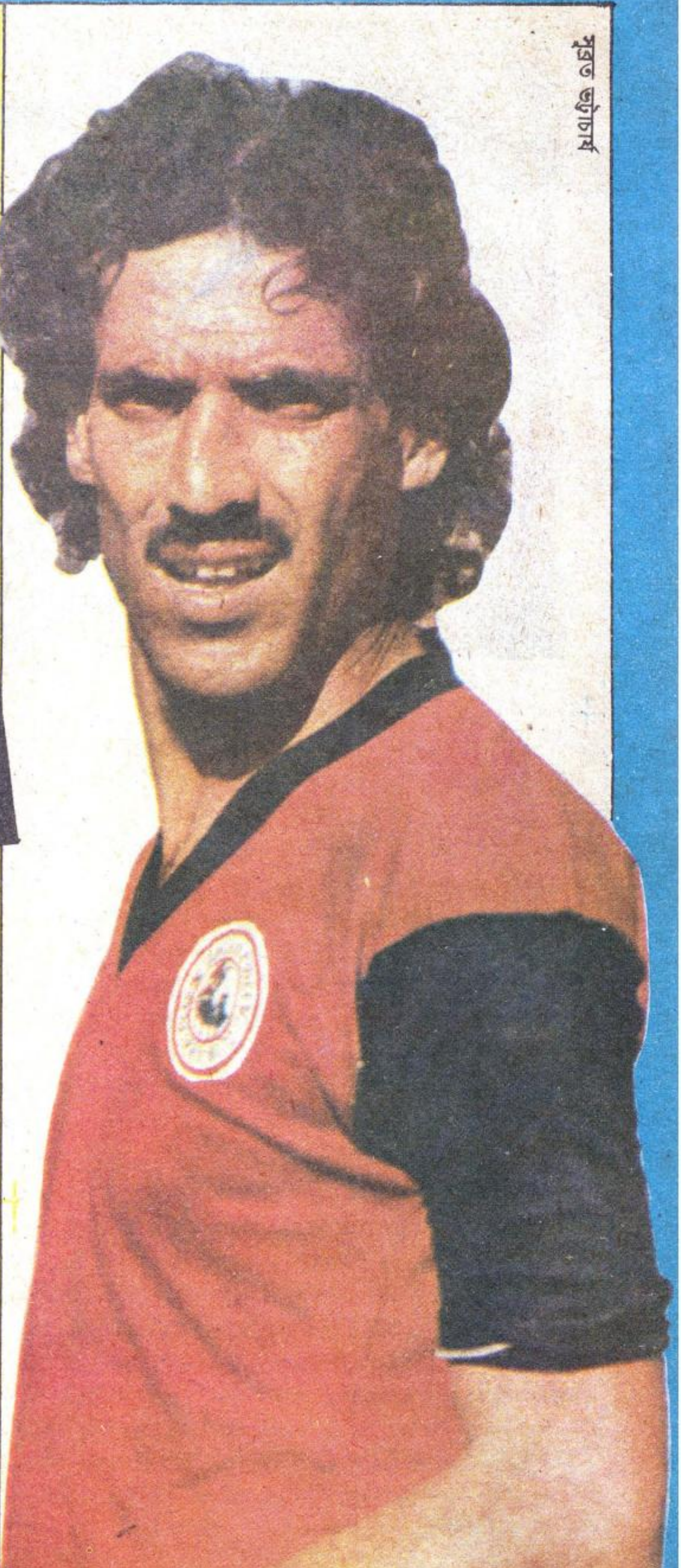

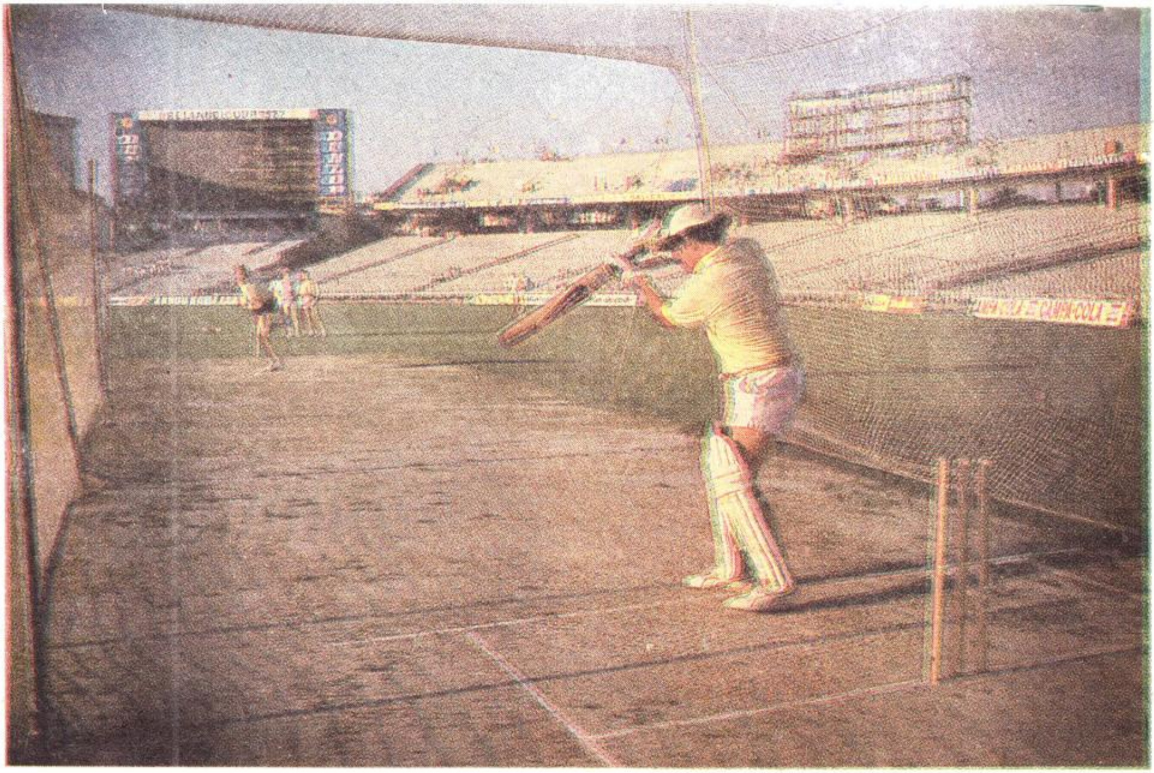

অস্ট্রেলিয়ার অ্যালন বর্ডার

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েও ভারত শেষ পর্যন্ত ২-৩ গোলে নতি স্বীকার করলো পাকিস্তানের কাছে। খেলা শুরু হবার প্রায় সংগে সংগেই গোল করে ভারত এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু জয়ের মানসিকতার অভাবে ভারত সেই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারেনি। সেই সংগে হারিয়ে গিয়েছিলো হকিতে সোনা জেতার স্বপ্ন। তাছাড়া প্রায় সব বিভাগেই ব্যর্থ হলো ভারত। টেনেটুনে ভারত পেলো মাত্র একটি সোনা, আটটি রুপো আর চৌদ্দটি ব্রোঞ্জ। পাকিস্তান কিন্তু চারটি সোনা পেয়েছে। এই সব কারণেই সেজদাদু অতো রেগে গেছেন। তাঁর রেগে যাবার অবশ্য আরও কারণ আছে। এবার ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা রাবার হারালেও খুব একটা খারাপ খেলেননি। দলনেতা আজহারউদ্দিন যথারীতি দারুণ খেলেছেন, ফর্ম ফিরে পেয়েছেন সহকারী দলনেতা রবি শাস্ত্রী, ভাল ব্যাট-বল দুই করেছেন বর্ষীয়ান অলরাউণ্ডার কপিলদেব, দুই তরুণ ব্যাটসম্যান শচীন তেণ্ডুলকার ও সঞ্জয় মঞ্জরেকার সুন্দর ব্যাট করেছেন। ব্যাটিংয়ের শক্তি যথেষ্ট থাকলেও বোলিংয়ে যে ভারত দুর্বল তার প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেছে। তাহ'লেও ভারতীয় দলের খেলা খুব একটা হতাশ করার মতো নয়। কিন্তু বেদী আর গাভাসকারের ঠাণ্ডা লড়াইটাই সকলকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলো।

গাভাসকারকে এম সি সি সম্মান জানাতে আজীবন সদস্য করে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু লর্ডসে জয়ন্তী ম্যাচে তাঁর সংগে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিলো বলে সুনীল গাভাসকার ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর সদস্যপদ। ব্যাপারটা পুরোপুরি গাভাসকারের ব্যক্তিগত। কিন্তু হঠাৎ তাতে নাক গলিয়ে বসলেন ভারতীয় দলের ম্যানেজার বিষেণ সিং বেদী। তিনি জোরালো গলায় গাভাসকারের এই মনোভাবের নিন্দা করে বললেন, এতে ভারতীয় ক্রিকেটকে অপমান করা হয়েছে। বেদী তাঁর লিখিত বক্তব্য সাংবাদিকদের দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে কম হাসাহাসি হয়! গাভাসকারের মনোভাবে নয়, বেদীর আচরণেই ভারতের সম্মান হানি ঘটেছে। এই সব ব্যাপার দেখে সেজদাদুও গেছেন ক্ষেপে।

সেজদাদু আরও রেগে গেলেন যেদিন আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে গোল খাবার পর ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে মহামেডান স্পোর্টিং খেলতে অস্বীকার করলো। অবশ্য তার শাস্তিও পেয়েছে মহামেডান। আই এফ এ তাদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাসপেণ্ড করেছে। অবশ্য এই শাস্তি তুলে নেবার জন্যে চেষ্টা করছে মহামেডান। কিন্তু মহামেডানের ঐ আচরণ বরদাস্ত করতে পারেননি সেজদাদুর মতো ক্রীড়াবিদ। তবে

সঞ্জয় মঞ্জরেকার

আই এফ এ মহামেডানকে সাসপেন্ড করার পর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, উচিত শাস্তি হয়েছে। আই এফ এ যদি আরও আগে থেকে এমন কড়া হতে পারতো তাহ'লে কলকাতার ফুটবলের এই হাল হতো না।

সে যাই হোক–পাকিস্তানে এখন টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। পাকিস্তানে খেলতে গেছে নিউজিল্যান্ড। ইমরান খান এতোদিনে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর জায়গায় পাকিস্তান দলের অধিনায়ক হয়েছেন জাভেদ মিয়াদাদ। ইমরান ক্রিকেট বিশ্বের একজন ডাকসাইটে খেলোয়াড়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন অলরাউন্ডারের অন্যতম ছিলেন তিনি। ইংলন্ডের ইয়ান বথাম, নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি, পাকিস্তানের ইমরান খান আর ভারতের কপিলদেবের মধ্যে হ্যাডলি আর ইমরান মাঠ থেকে সরে গেছেন। বথাম চাইছেন আরও কিছুদিন খেলতে। কিন্তু পুরানো ফর্ম ফিরে পাচ্ছেন না বলে তিনি ইংলন্ড দলে ঢুকতে পারছেন না। আর ভারতের কপিলদেবের বলের ধার অনেকটা কমে গেলেও এখনও যা আছে তাতে তিনি আজও ভারতের এক নম্বর স্ট্রাইক বোলার। তাছাড়া ব্যাট হাতে নিয়েও তিনি দাপিয়ে [illegible]। এবার ইংলন্ডে খেলতে গিয়ে তিনি দারুণ ব্যাট করেছেন। সেঞ্চুরি করেছেন, পরপর চার বলে চারটি ওভার বাউন্ড্যারি হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। যাঁরা এতোদিন চিৎকার করছিলেন, কপিল ফুরিয়ে গেছেন ফুরিয়ে গেছেন

রিচার্ড হ্যাডলি

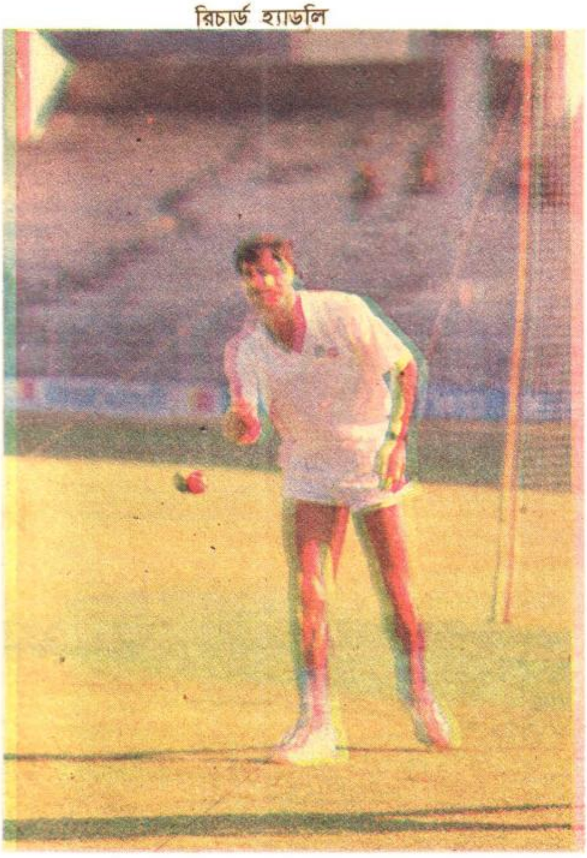

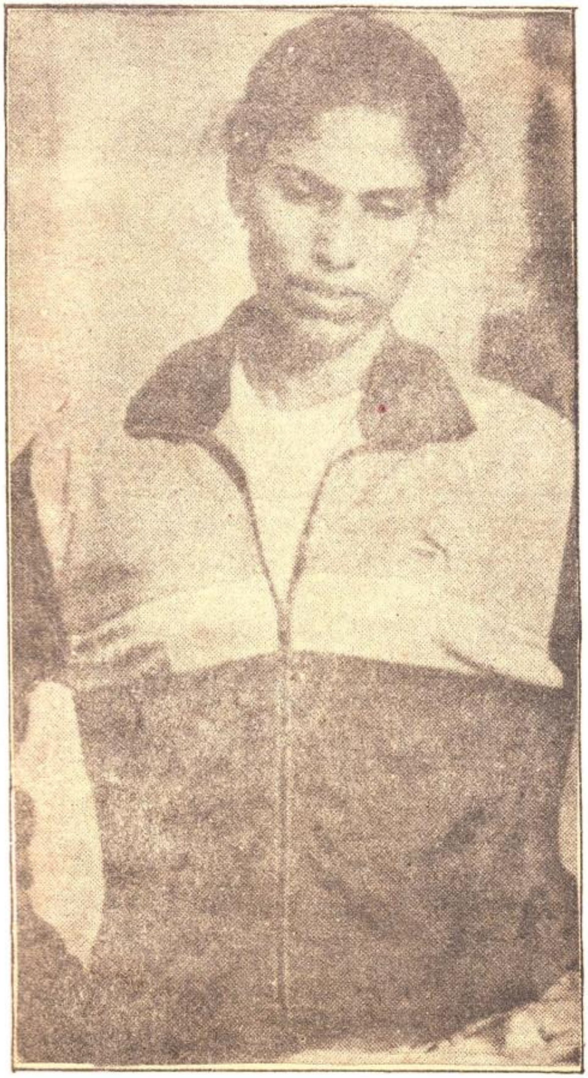

পিকিংয়ের ট্র্যাকে পি. টি. ঊষা।

বলে–তাঁরা নিশ্চয়ই এবার চুপ করে যাবেন।

এই শীতের শেষের দিকে পাকিস্তান দলের ভারতে খেলতে আসার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আসতে পারবে কিনা কে জানে। পাকিস্তান না এলে সেই জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আনার চেষ্টা করছেন ভরতীয় ক্রিকেটের কর্তারা। তবে এশিয়া কাপ ক্রিকেট ভারতে হচ্ছে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে এই প্রতিযোগিতাটি হবে। ফাইনাল খেলা কলকাতার ইডেন উদ্যানে হবার কথা। অবশ্য তার আগেই কলকাতায় ইরানী ট্রফির খেলা হবে। রণজি ট্রফি বিজয়ী বাংলা খেলবে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটের আরও কয়েকটি খেলা কলকাতায় হবে। সব মিলিয়ে কলকাতার ক্রিকেটের আসর এবার জমজমাট। এর ওপর টেস্ট ম্যাচ হলে তো সোনায় সোহাগা।

সে যাই হোক, সোজদাদু যে জন্যে খেলাধুলার ওপর এতো রেগে গেছেন সেই এশিয়াডের পদক তালিকার ওপর একবার

চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক–

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
চীন	১৮৩	১০৭	৫১
দক্ষিণ কোরিয়া	৫৪	৫৪	৭৩
জাপান	৩৮	৬০	৭৬
উত্তর কোরিয়া	১২	৩১	৩৯
ইরান	৪	৬	৮
পাকিস্তান	৪	১	৭
ইন্দোনেশিয়া	৩	৬	২১
কাতার	৩	২	১
থাইল্যান্ড	২	৭	৮
মালয়েশিয়া	২	২	৪
ভারত	১	৮	১৪
মঙ্গোলিয়া	১	৭	৯
ফিলিপিনস	১	২	৭
সিরিয়া	১	০	২
ওমান	১	০	০

(একাদশ এশিয়াডে সোনা পাওয়া দেশগুলির পদক তালিকাই শুধু দেওয়া হলো।)

পেলে পেলেই

বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তী পেলে গত ২১ অক্টোবর পঞ্চাশ বছরে পা দিলেন। ফুটবল সম্রাটের জন্মদিন এবার বেশ বড় আকারে পালন করা হয়েছে। সম্বর্ধনা-টম্বর্ধনা তো আছেই। তাছাড়া পেলের জন্মদিন উপলক্ষে গত ৩১ অক্টোবর রোমের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে বসেছিলো এক সাড়া জাগানো ফুটবল খেলার আসর। ব্রাজিলের সঙ্গে সেদিন খেলতে নেমেছিলো অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ। পেলে নিজেও সেদিন খেলতে নেমেছিলেন। বর্তমান বিশ্বের সব তারকা খেলোয়াড়রা সেদিন বলের রাজা পেলেকে সম্মান জানাতে মাঠে নেমেছিলেন।

জন্মদিন পালন করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পেলে প্রথমে গিয়েছিলেন ইতালির মিলানে। মিলান থেকে একটি খেলার কাগজ বের হয়। নাম গ্যাজেটা ডেলো স্পোর্ট। পেলে মিলানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পত্রিকার সাংবাদিকেরা তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে। পেলের সঙ্গে নানা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছিলো। তাঁরা

কলম্বিয়ার ভালদারামা

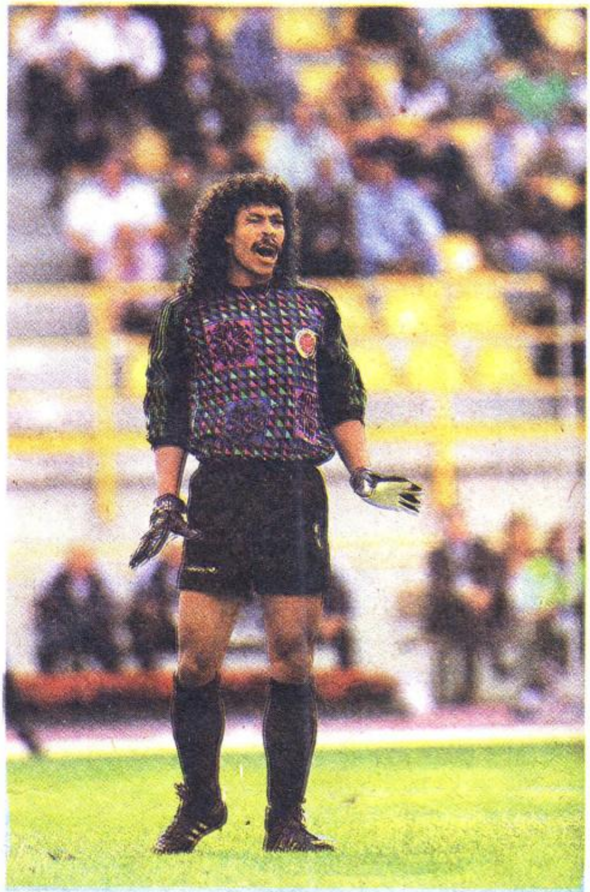

রেনে হিগুইতা

পেলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনার পর বিশ্ব ফুটবলে সুপারস্টার হবার সম্ভাবনা কার ?

পেলে বলেছিলেন, মারাদোনা তো ইতালির বিশ্বকাপে খেলতে না পারলেও সুপার স্টারই রয়ে গেলেন। দ্বিতীয় পেলেকে আপনারা যেমন খুঁজে পাননি, তেমনি দ্বিতীয় মারাদোনাকেও পাবেন না। মারাদোনার পর কে বিশ্ব ফুটবলকে মাতাবেন তা বোধহয় এই মুহূর্তে সরাসরি বলা উচিত নয়। তবে আপনাদের ব্যাজিওর মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে। সিলাচি কোনোদিন সুপারস্টারের পর্যায়ে পৌছুতে পারবে না। ব্যাজিও কিন্তু পারতে পারে। ইতালিতে বিশ্বকাপের খেলা দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে। আমার মতে রাবার্তো ব্যাজিওরই মারাদোনার ফেলে যাওয়া সুপারস্টারের আসনটি দখল করার সব থেকে বেশি সম্ভাবনা। তবে তার জন্যে আমাদের এখনও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এরপর ক্রীড়া পত্রিকাটি টেকনিকাল প্রশ্ন করেছিলো। তারা জানতে চেয়েছিলো, ফিফা যে ফুটবল খেলাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছে সেই প্রসঙ্গে। পেলে উত্তরে বলেছিলেন, ফুটবল খেলায় সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপারটা হলো গোল। দর্শকরা গোল করা দেখতেই সব থেকে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু গোলের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফুটবল খেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে গোলের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। সেই জন্যেই ফিফার কর্তারা এখন চিন্তা করছেন দুই গোল পোস্টের মধ্যের দূরত্ব কিছুটা বাড়াতে। এতে ভালোই হবে। এ ছাড়া গোলরক্ষকদের হাত দিয়ে বল ধরার জায়গাটাও কমিয়ে আনা উচিত। এতে গোলের সংখ্যা বাড়বে। দর্শকরাও খেলা দেখে আনন্দ পাবেন।

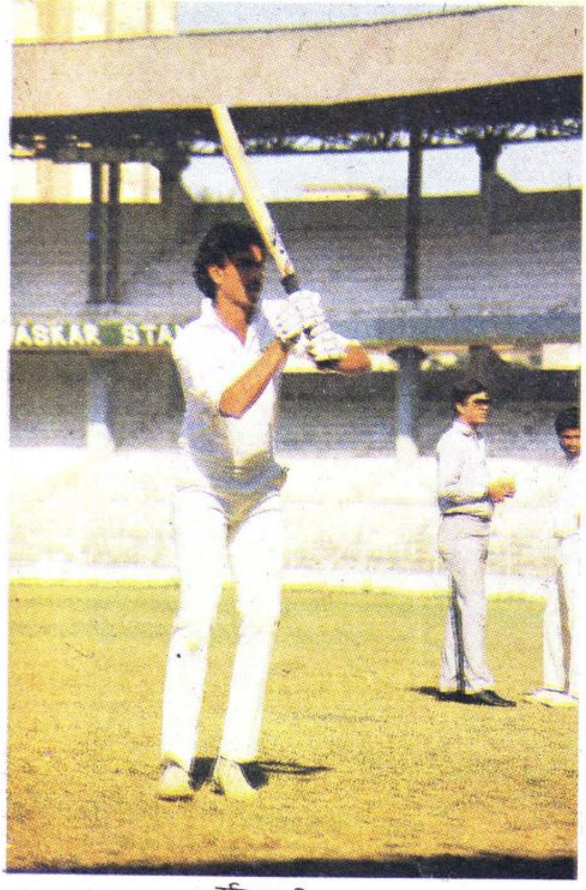

রবি শাস্ত্রী

উক্তি

পিকিংয়ে সোনা না পাওয়ায় আমি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি। তবু বলছি, আমার পারফরমেন্সে আমি সন্তুষ্ট।

—পি টি উষা

(এশিয়াডের পর দিল্লী ফিরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়।)

বড় খেলায় গোল করার সুযোগ নষ্ট করলে কিছুতেই জেতা যায় না।

—ঝমনলাল

(পিকিং এশিয়াডে হকিতে পাকিস্তানের কাছে ৩-২ গোলে হারার পর ভারতের কোচ এই কথা বলেছিলেন।)

আমার লক্ষ্য, প্রথমে চারশ উইকেট দখল করা, তারপর হ্যাডলির রেকর্ড ভাঙা।

—কপিলদেব নিখাঞ্জ

(সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়।)

কলকাতার ফুটবলের উন্নতি করতে হলে আমাদের কড়া হতেই হবে।

—প্রদ্যোত দত্ত

(মহামেডান স্পোর্টিংকে সাসপেন্ড করার পর)

ভারতের সম্মান বজায় রাখার জন্যে আমি চিরকাল আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো।

—লিয়েন্ডার পেজ

(জুনিয়ার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতায় বাড়ি ফেরার পর।)

চার বছর পরে যদি আমেরিকার কোচ হিসেবে বিশ্বকাপের আসরে অবতীর্ণ হই তাহ'লে অবাক হবেন না। আমেরিকায় ভালো খেলোয়াড় আছে। তাদের শুধু তৈরি করে নিতে হবে।

—ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার

(সম্প্রতি নিজের দেশে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন বিশ্বকাপ বিজয়ী জার্মান দলের কোচ কাইজার বেকেনবাউয়ার।)

এম. সি. সি-র আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ না করে সুনীল গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেটের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

—বিষেণ সিং বেদী

(গাভাসকার এম. সি. সি-র সদস্যপদ ছাড়ার পরদিন এক বিবৃতিতে। এ কথা বলেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার।)

ওলিম্পিকে দুই জার্মান যদি মিলে গিয়ে সম্মিলিত দল নিয়ে আসে তাহ'লে আমাদের তো আপত্তি করার কিছু থাকবে না।

—সামারাঞ্চ

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

বল ধরতে চলেছেন ইতালির ব্যাগিও

স্পোর্টস কুইজ

(এবারের সব প্রশ্নোত্তর এশিয়াড নিয়ে)

প্রশ্নঃ

(১) এশিয় ক্রীড়ার (এশিয়ান গেমস) নামকরণ কে করেছিলেন ?

(২) ১৯৫১ সালে দিল্লির প্রথম এশিয় ক্রীড়ায় কোনো প্রদর্শনী খেলা ছিলো কি ? থাকলে কি কি ?

(৩) কোন ভারতীয় কর্মকর্তাকে এশিয় ক্রীড়ার জনক বলা হয় ?

(৪) ১৯৭৮ সালে কোন কোন দেশ এশিয় ক্রীড়ার দায়িত্ব পেয়েও পিছিয়ে গিয়েছিলো ? শেষ পর্যন্ত সেবারের প্রতিযোগিতা কোথায় হয়েছিলো ?

(৫) কোন সাঁতারু এশিয়াডে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছিলেন ?

(৬) সিওল এশিয়াডে ভারত পাঁচটি সোনা জিতেছিলো। তার মধ্যে চারটি ছিলো অ্যাথলেটিকসে। পঞ্চম সোনাটি ভারতকে কে এনে দিয়েছিলেন ? কোন বিভাগ থেকে ?

(৭) এশিয়াডে ভারত-পাকিস্তানের হকি ফাইনাল খেলাটি চড়া মেজাজে হবার জন্যে কোন রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ?

(৮) এশিয়াডে ভারতের কোন মেয়ে প্রথম স্বর্ণপদক পেয়েছেন ?

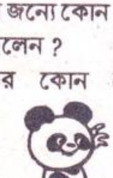

উত্তরঃ

(১) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

(২) ছিলো। কাবাডি আর সেপক টেকরা।

(৩) গুরুদত্ত সোন্ধীকে।

(৪) পিছিয়ে গিয়েছিলো সিংগাপুর আর পাকিস্তান। প্রতিযোগিতা হয়েছিলো ব্যাংককে।

(৫) শচীন নাগ।

(৬) কার্তার সিং। কুস্তি থেকে।

(৭) ১৯৫৮ সালে টোকিওর এশিয় ক্রীড়ায়—জাপানের সম্রাট হিরোহিতো বিরক্ত হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

(৮) ১৯৭০ সালে ব্যাংককের এশিয়াডে 400 মিটার দৌড়ে ভারতের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী হিসেবে সোনা জিতেছিলেন কমলজিৎ সান্ধু।

ছয়ে ছক্কা

ওভার বাউন্ডারি বা ছক্কা—এই কথাটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে উল্লাস আর শিহরন। সেই ছক্কা যদি পর পর মারা হয় তাহলে তো আর দেখতে হবে না। আনন্দে, রোমাঞ্চে সমস্ত মাঠ ফেটে পড়বে। যেমন কিছুদিন আগে পড়েছিলো লর্ডসে। ভারত তখন ফলো অনের মুখে। ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে ভারতের অল রাউন্ডার কপিলদেব। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, অপর প্রান্তে তো হিরওয়ানি। ও হয়তো এক বলেই আউট হয়ে যাবে। তাহলে ? যা করার এখনই করতে হবে। কপিল আম্পায়ার ডিকি বার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, হেমিংসের আর কটা বল বাকি। আম্পায়ার বললেন, হেমিংস আরও চারটে বল করবে। কপিল গিয়ে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পর পর চারটি বল উড়িয়ে দিলেন মাঠের ওপর দিয়ে। চার বলে চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ে বসলেন কপিলদেব। টেস্ট খেলায় কপিলের আগে কেউই পর পর চারটি ছক্কা হাঁকাতে পারেননি। প্রথম শ্রেণীর খেলায় অবশ্য ছ'বলে ছ'টা ছক্কা হাঁকিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার গারফিল্ড সোবার্স আর ভারতের রবি শাস্ত্রী। কিন্তু টেস্টে কপিলই ছক্কা সম্রাট!

খবর-টবর

সেঞ্চুরি—দশ

টেস্ট ক্রিকেটে ১০টি বা তার চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র ৫১ জন ব্যাটসম্যান। এই তালিকায় নতুন নামটি হলো ভারতের অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে এবার দ্বিতীয় শতরানটি করার পর আজহার ৫১ জনের একজন হয়েছেন। এই তালিকায় আছেন ইংলন্ডের ১৬ জন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১১ জন, অস্ট্রেলিয়ার ১০ জন, পাকিস্তান ও ভারতের ৬ জন করে, আর নিউজিল্যান্ডের ২ জন। ভারতের যে ছ'জন ব্যাটসম্যান দশটা বা তার বেশি সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা হলেন—সুনীল গাভাসকার (৩৪টি), দিলীপ বেংসরকার (১৭টি), জি. আর বিশ্বনাথ (১৪টি), পলি উমরিগড় (১২টি), মহিন্দর অমরনাথ (১১টি) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন (১০টি)।

বিশ্ব ক্রিকেটে সব থেকে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড সুনীল গাভাসকারের। তিনি ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ৪টি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৩টি, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২টি সেঞ্চুরি করেছেন।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

অংশুমান রায়চৌধুরী (নিউ আলিপুর)

উত্তর: তোমার গড়া বিশ্ব একাদশ দু'টি ছেপে দেওয়া হলো। এক নম্বর দল—ভিভ রিচার্ডস (অধিনায়ক), ইমরান (সহ-অধিনায়ক), গাভাসকার, শ্রীকান্ত, মিয়াদাদ, বর্ডার, বথাম, গার্নার, ইউসুফ (উইকেট রক্ষক), মার্শাল ও মণিন্দর সিং। দ্বাদশ ব্যক্তি—মার্টিন ক্রো।

দু'নম্বর দল—ডেভিড গাওয়ার (অধিনায়ক), মাইক গ্যাটিং (সহ-অধিনায়ক), রবি শাস্ত্রী, কপিলদেব, আজহারউদ্দিন, রিচার্ডসন, গ্রিনিজ, দুজোঁ (উইকেট রক্ষক), রিড, লোগি ও হ্যাডলি। দ্বাদশ ব্যক্তি—রমন লাম্বা।

গোপালচন্দ্র পাল (বেলতলা পার্ক, বালুরঘাট)

প্রশ্ন: বর্তমান ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান কে?

উত্তর: উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবু আমার মনে হয় আজহারউদ্দিনই বর্তমান ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান।

বিনিতনাথ চৌধুরী (গুণময়ী রোড, তারাপুর, শিলচর, কাছার)

উত্তর: তোমার গড়া বিশ্ব একাদশটি ছেপে দেওয়া হলো—সুনীল গাভাসকার (অধিনায়ক), ভিভ রিচার্ডস (সহ-অধিনায়ক), অ্যালান বর্ডার, কপিলদেব, ম্যালকম মার্শাল, ডেভিড বুন, ইমরান খান, জাভেদ মিঁয়াদাদ, জেফ দুজোঁ (উইকেট রক্ষক), রবি শাস্ত্রী, মহিন্দর অমরনাথ। দ্বাদশ ব্যক্তি—ওয়াসিম আক্রাম।

(বিশ্ব একাদশ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে খেলবে বলে ইংলন্ডের কোনো খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়নি।)

মিঠু বিশ্বাস (সরকারবাড়ি লেন, কলকাতা-৩)

প্রশ্ন: কপিলদেব, রবি শাস্ত্রী ও সুনীল গাভাসকারের বাড়ির ঠিকানা চাই।

উত্তর: খেলোয়াড়রা চান না তাঁদের বাড়ির ঠিকানা কোনো পত্রিকায় ছাপা হোক। তবে কপিলদেবকে হরিয়ানা ও শাস্ত্রী ও গাভাসকারকে বোম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানায় চিঠি দিলে ওঁরা পাবেন।

হরিপদ চক্রবর্তী (তিনসুকিয়া, অসম)

উত্তর: অরুণলালকে C/O সি. এ. বি ক্লাব হাউজ, ইডেন উদ্যান, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি দিলে উনি পাবেন।

পাপুল সরকার (আলিপুরদুয়ার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন: একজন ব্যাটসম্যান বল মেরে অপর প্রান্তের উইকেট ভেঙে দিল। তখন নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান ক্রিজের বাইরে ছিলেন। তা'হলে কি তিনি আউট হবেন?

উত্তর: না। তবে বলটা উইকেটে লাগার আগে কেউ যদি ছুঁয়ে দিতে পারেন তাহলে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান আউট হবেন।

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল একটি ঐতিহ্যশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলের ছাত্ররা পড়াশুনার সংগে খেলাধূলাতেও সমান উৎসাহী। প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ মাস তিনেক হলো দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। স্কুলের সব বিষয়েই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এই স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনার উপর যেরকম জোর দেওয়া হয় সেরকম খেলাধূলাতেও তাদের উৎসাহিত করা হয়। প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে বললেন, 'ছেলেরা নিশ্চয় খেলাধূলা করবে। না খেললে সেটা তো একটা ব্যাধি।' তিনি আরও জানালেন, 'ছাত্রেরা খেলাধূলায় খুবই উৎসাহী এবং পারদর্শী। তবে আমরা তাদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করতে পারছি না। তার মূল কারণ খেলাধূলার উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তবু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব ছাত্রদের উৎসাহিত করার।

এ বছর এই স্কুলের ১৭১ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪০ জন ১ম ডিভিশন, ৩০ জন ২য় ডিভিশন ও ১ জন ৩য় ডিভিশনে পাশ করেছে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর ৮১৬ পেয়েছে সুমিত চ্যাটার্জী।

এই স্কুলের ছাত্রেরা ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স ও সুইমিং-এ অংশগ্রহণ করে থাকে। অ্যাথলেটিক্সে এক সময়ে এই স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল। ক্যাডবেরি স্পোর্টসে এই স্কুলের ছাত্রেরা বহুবার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে ছাত্ররা ইন্টার স্কুল সাবডিভিশনাল মিটে ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ, ৪০০ মিঃ, ৮০০ মিঃ, ৫০ মিঃ (জুনিয়ার) দৌড়ে, হাইজাম্প, লংজাম্প ও ডিসকাস থ্রোতে অংশগ্রহণ করে। গত বছর এই স্কুলের দেবাশীষ সাহা বরানগর জোনে ৮০০ মিঃ ও ৪০০ মিঃ দৌড়ে প্রথম হয়। ২য় স্থানও পায় এই স্কুলের ছাত্র। অ্যাথলেটিক্সে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো সঞ্চয় ঘোষাল, সঞ্জয় দত্ত, সুরজিৎ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মিত্র ও স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।

ফুটবলে এই স্কুল ইন্টার স্কুল জোনাল মিট ও বঙ্কিম কাপে অংশগ্রহণ করে। দুটিতেই তারা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর চেয়ে বেশি কিছু তাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব হয় না, তার কারণ গেমস টিচার বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর মতে স্কুলের ফুটবল দলের ক্ষেত্রে ছাত্রদের যে বয়স দেওয়া থাকে তা তাঁরা সঠিকভাবে মেনে চলেন, কখনই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। কিন্তু অন্যান্য অনেক স্কুলই ছাত্রদের বয়সের নিয়ম মেনে চলে না। যার ফলে তাঁদের স্কুলের ১৫/১৬ বছরের ছেলেরা বিপক্ষ স্কুলের ২০ বছরের ছেলেদের সংগে অনেক সময়ই পেরে ওঠে না, তবু তারা যতটা সম্ভব লড়াই করবার চেষ্টা করে। এই স্কুলের দেবাশীষ সাহা, রূপেন বিশ্বাস ও কল্যাণ দাস সাবডিভিশন দলে সুযোগ পেয়েছে। '৮৯ সালে স্কুলের পক্ষ থেকে দেবাশীষ সাহা ও মলয় বিশ্বাসকে বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার নির্বাচিত করা হয়েছে। স্কুলের বর্তমান ফুটবল দলে খেলে রূপেন বিশ্বাস (অধিনায়ক), দেবাশীষ সাহা, কল্যাণ দাস, সুরজিৎ চক্রবর্তী, সঞ্জয় মিত্র, স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, সঞ্জয় দত্ত, শুভেন্দু ব্যানার্জী, শুভংকর সান্যাল, সঞ্চয় ঘোষাল ও সঞ্জয় চ্যাটার্জী।

সি. এ. বি. আয়োজিত সামার ক্রিকেটেও এই স্কুল অংশগ্রহণ করে থাকে। স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সঞ্জয় মিত্র বর্তমানে এরিয়ান্স ক্লাবে ২য় ডিভিশনে ক্রিকেট খেলছে। সঞ্জয় বর্তমানে স্কুলের সেরা ক্রিকেটার। অন্যান্য ক্রিকেটাররা হলো মুকুল বিশ্বাস, দেবাশীষ ব্যানার্জী, স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, লিটন চন্দ, শুভেন্দু ব্যানার্জী, সঞ্জয় চ্যাটার্জী, মন্টু বিশ্বাস, তামসরঞ্জন ব্যানার্জী, কল্যাণ দাস ও সঞ্চয় ঘোষাল।

এই স্কুলের ছাত্র সোমশুভ্র গাংগুলী নর্থ ২৪ পরগনা ইন্টার জোন মিটে ৫০ মিঃ-এ প্রথম হয় এই বছর।

স্কুলের তিনজন গেমস টিচার—বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মনোজ মাইতি ও অসিতরঞ্জন ঘোষ। এ ছাড়াও স্কুলের আরেক শিক্ষক বিষ্ণুপদ দে খেলাধূলায় খুবই উৎসাহী। উনি সর্বদাই খেলাধূলার সময় উপস্থিত থেকে সবরকম সহযোগিতা করে থাকেন।

গেমস টিচার বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু নিজেও একজন নামী অ্যাথলিট ছিলেন। তিনি অপর দুই গেমস টিচারের সহযোগিতায় ছাত্রদের খেলাধূলার অনুশীলন করান। ওঁর মতে, 'আমাদের প্রধান শিক্ষক খুবই উৎসাহী। খেলাধূলায় উনি সর্বদাই সহযোগিতা করে থাকেন। ছাত্ররাও খুবই উৎসাহী, তাদের অনেকের মধ্যেই প্রতিভা আছে। তবে আমরা আর্থিক সমস্যার জন্য সেভাবে খেলাধূলার উন্নতি করতে পারছি না।'

ফুটবলার গৌতম সরকার, শুভংকর সান্যাল ও অলোক সাহা এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

সত্যি !

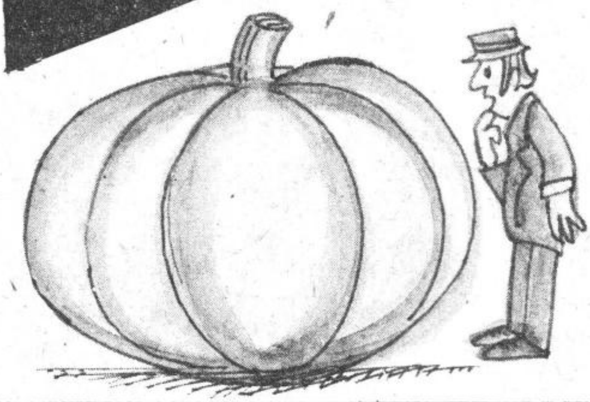

কিপটেদের রানী

হেনরিয়েটা হাউল্যান্ড গ্রিনের বিষয়-আশয়ের মূল্য ২৭০ মিলিয়ন পাউন্ড। তাঁর একটা ব্যাংকের টাকার হিসাবই ছিল ৬.২ মিলিয়ন পাউন্ড। তবু তিনি শুধু পরিজ খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেন। তাও ঠান্ডা, পাছে গরম করতে গেলে জ্বালানি খরচ হয়।

রথ দেখা কলা বেচা

জাপানের সিকো কোম্পানী তাদের রিস্টওয়াচ–টিভির দৌলতে এটিকে সম্ভব করেছে। ঘড়িতে টিভির স্ক্রিনটির মাপ ১.২ ইঞ্চি। হেডফোন আর রিসিভার ইউনিট সমেত এই সাদা কালো টিভি সেটটির ওজন মাত্র ৩২০ গ্রাম। এটিই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট টিভি।

একটা কুমড়ো ২২৩৮ কেজি !

এই অসম্ভবটি সম্ভব করেছিলেন হাওয়ার্ড ডিল। তিনি থাকেন নোভাস্কোশিয়ার উইন্ডসোর-এ।

থামা না পাখি

প্রুডল কিন্তু এ কথা কানেই তুলবে না। কারণ সে যে ১২ বছর ধরে শ্রেষ্ঠ কথাবলা পাখির সম্মান পেয়ে এসেছে লন্ডনের বার্ড শোতে। তার ভান্ডারে আছে ১000টি শব্দ। উগান্ডায় দেশ হলেও এই পুরুষ কাকাতুয়াটি তার মালিকের সংগে থাকে লন্ডনে।

ব্রাদার বাটিস্টার গুপ্তধন

টাকা পয়সা মণি মাণিক্য নয় ব্রাদার গিওভ্যানি বাটিস্টা অরসেনিগো তিনটি বিরাট বাক্সে জমিয়েছিলেন শুধু মানুষের দাঁত যা তিনি ডেনটিস্ট থাকাকালীন তুলেছিলেন। ১৯০৩ সালে দেখো গিয়েছিল এই ইতালীয় ভদ্রলোকটির কাছে আছে ২ 0,00,৭৪৪টি দাঁত।

মিকি যদি থাকত......

তাহলে একদিনেই সব ইঁদুর সাবাড় হয়ে যেত। কারণ মিকি ২৩ বছর ধরে মেরেছিল ২২,000 ইঁদুর।

ছবিঃ সুফি

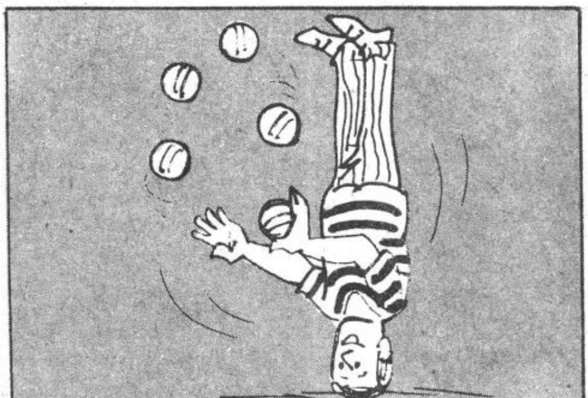

শীর্ষাসনে জাগলিং !

সম্ভব যে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আমেরিকার রবি মে। শরীরকে উল্টে মাথার ওপর খাড়া হয়ে তিনি পাঁচটা বল নিয়ে জাগলিং করতে পারেন।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

দুর্গা পুজো, কালী পুজো–সব শেষ। এবার অপেক্ষা সরস্বতী পুজোর। অবশ্য কান পাতলে বাজীর শব্দ এখনও শোনা যায়। পটকার আওয়াজে চমকে উঠে মনে হবে–আরে কালীপুজো তো কবেই হয়ে গেছে। শরৎ বিদায় নিয়েছে, হেমন্তও যাই যাই করছে। তোড়জোড় শুরু হয়েছে শীতের। গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা ফুটতে শুরু করেছে। উত্তরে হাওয়ায় এখনও অবশ্য শীতের কামড় নেই। তবে রোদের তেজ কমে গেছে। এখন আর সেই গা পোড়ানো গরম নেই। ভোরবেলায় ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু ভোরের রোদে চকচক করে ওঠে। বিকেলটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাল দিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা। খেজুর গাছের গলার কাছটা চেঁচে রস সংগ্রহের কাজ শুরু হচ্ছে। ঐ রস থেকে গুড় হবে, পাটালী হবে, নতুন গুড়ের সন্দেশ হবে। মাঠে মাঠে নেমে পড়বে ব্যাট-বল। শুরু হবে ক্রিকেট খেলা। শীতের দুপুরে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে কি ভালোই না লাগে! আগে এই সময় অ্যানুয়াল পরীক্ষা হতো। এখন তো পরীক্ষা অনেক পিছিয়ে গেছে।

থাক ওসব কথা। কলকাতার তিনশ বছর নিয়ে তো অনেক হৈচৈ হলো। অনেকে বললেন, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক। কথাটা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়। কলকাতা তিনশ বছরের চেয়ে অনেক অনেক পুরোনো। তবে শহর কলকাতার জনক বা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অবশ্য আমরা চার্ণক সাহেবের নাম বলতে পারি। কলকাতা ছিলো একটা গন্ডগ্রাম। এখনকার ধর্মতলা, জানবাজার, বউবাজার, মির্জাপুর এই সব অঞ্চল নিয়েই ছিলো কলকাতা গ্রাম। তখন কলকাতা ছিলো বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীর মধ্যে। কলকাতার দু পাশে দুটো গ্রাম ছিলো–সুতানুটি আর গোবিন্দপুর। এখনকার চিৎপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার আর হাটখোলা অঞ্চল নিয়ে ছিলো সুতানুটি। আর গোবিন্দপুর গ্রামটা ছিলো এখনকার হেস্টিংস, ময়দান ও আশপাশের অঞ্চল নিয়ে।

জোব চার্ণক সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে গ্রাম তিনটি কিনে নিয়েছিলেন। কতো টাকায় জানো ? মাত্র তেরোশ টাকায়। আজ থেকে তিনশরও বেশি বছর আগে তেরোশ টাকার দাম কতো ছিলো ভাবো দেখি একবার। সে তো হলো–কিন্তু তিনটি গ্রাম কিনে তার নাম কলকাতা দেওয়া হয়েছিলো কেন বলো দেখি ? আসলে কলকাতা গ্রামেই বিদেশীরা বেশি সংখ্যায় থাকতেন। যাঁরা যেখানে থাকেন তাঁদের মাথায় সেই জায়গাটার নামই তো আগে আসে। তাই তিনটি গ্রাম কিনে একত্রিত করে চার্ণক সাহেব সকলের ইচ্ছে মতো নাম দিলেন কলকাতা।

চার্ণক সাহেব কিন্তু প্রথমে কলকাতায় এসে নামেননি। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট, রবিবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার কুঠিগুলোর কর্তা জোব চার্ণক এখনকার বাগবাজারের ঘাটে অর্থাৎ সুতানুটি গ্রামে এসে নেমেছিলেন। তখন ঠিক দুপুর বেলা। একটু আগে জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। চারদিক গাছ-গাছালিতে ভরা। পাখির ডাক ভেসে আসছে। গাঁয়ের মানুষ খেয়ে দেয়ে দুপুরে ঘুমোচ্ছে। হুগলী নদীর তীরে দু চারটে নৌকো বাঁধা। পরিবেশটা ছিলো অনেকটা এইরকম। আর ঐ দিনটিকেই ঐতিহাসিকরা শহর কলকাতার জন্মদিন বলে ধরে নিয়েছেন। গত ২৪ আগস্ট কলকাতার জন্মদিন বলে অনেক অনুষ্ঠানও হয়েছে। তার মধ্যে ছিলো, জোব চার্ণক সেজে একজনের বাগবাজারের ঘাটে নৌকো থেকে নামার অভিনয়। সব মিলিয়ে গত দু বছর ধরে খুব হৈচৈ হলো। শুকতারাতেও তো তোমরা কলকাতা শহরের পুরোনো দিনের গল্প পড়েছো। তাই ওসব নিয়ে আর কিছু বলছি না। শুধু বলছি, তোমরা কিন্তু কখনোই বলবে না কলকাতার তিনশ বছর বয়েস। বলবে, শহর কলকাতার বয়েস তিনশ বছর। কেমন! কলকাতা গ্রামের উল্লেখ মনসামঙ্গল কাব্য ছাড়াও অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্রেও পাওয়া যায়। তাই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক হতে পারেন না। তিনি শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা–সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা গ্রামকে নিয়ে যে শহর গড়ে উঠেছিলো তারই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জোব চার্ণক।

তোমরা সার্কুলার রোড দিয়ে নিশ্চয়ই যাওয়া আসা করেছো। আগে কলকাতার সীমানা ছিলো ঐ পর্যন্তই। ১৭৪২ সালে বর্গী অর্থাৎ মারাঠাদের আক্রমণ রোখার জন্যে শহরের তিনদিক ঘিরে খাল কাটা হয়েছিলো। খালটা ছিলো সুতানুটির উত্তর অংশ এখনকার গ্যালিফ স্ট্রীট-গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্যন্ত দীর্ঘ সাত মাইল। পরে সেই খাল বুজিয়ে নতুন বিশাল রাস্তা তৈরি করা হয়েছিলো–সেই রাস্তাই সার্কুলার রোড। সার্কুলার রোড ধরে যদি এখন দক্ষিণ দিকে যাও–তাহলে বুঝবে তোমার ডান দিকটাই ছিলো সাবেক কলকাতা। আর যে রাস্তা দিয়ে তুমি বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি কিংবা গাড়িতে করে যাচ্ছো–সেইটা একসময় খাল ছিলো, নৌকো চলতো। ভাবতেও অবাক লাগে তাই না!

এই দেখো কলকাতার কথা বলতে বলতে জায়গা শেষ। আজ তাহলে এই পর্যন্তই!

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

–তোমাদের দাদুমণি

অনুবাদ সিরিজ

বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন সংযোজন

জ্যাক লন্ডন-এর
হোয়াইট ফ্যাং
কল অব দ্য ওয়াইল্ড

রিচার্ড হেনরি ডানা-র
টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট

হেনরি হল কেইন-এর
দ্য বণ্ড ম্যান

জোয়ান রুডলফ ওয়াইজ-এর
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

চার্লস কিংসলি-র
হাইপেশিয়া

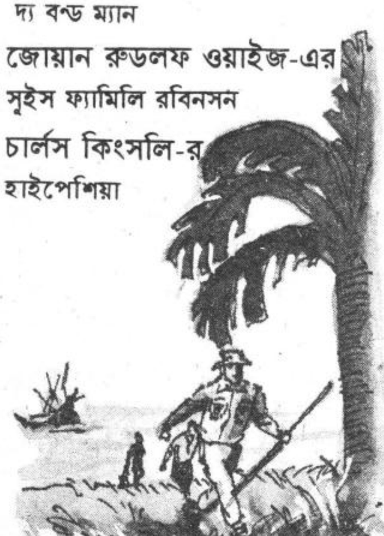

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌-এর
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্‌
ইনভিজিবল ম্যান
দ্য স্লীপার অ্যাওয়েক্‌স্‌

মার্ক টোয়েনের
অ্যাডভেঞ্চারস্‌ অব টম সইয়ার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্‌
এ কনেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থাস কোর্ট
দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর হ্যুগোর
লা মিজারেবল
টয়লার্স অব দ্য সী
হাঞ্চব্যাক অফ নৎরদাম
দ্য ম্যান হু লাফ্‌স্‌

এরিক মারিয়া রেমার্ক
দি ব্ল্যাক অবলিস্ক
অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট

এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট

র‍্যাফেল সাবাটিনির
অ্যাক্রস দ্য পিরেনিজ
দি লস্ট কিং

চার্লস ডিকেন্সের
নিকোলাস নিকোলবি
এ টেল অব টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
ডেভিড কপারফিল্ড
অলিভার টুইস্ট

হেনরি রাইডার হাপার্ড-এর
দি মুন অব ইজরায়েল
কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
কিডন্যাপ্‌ড
ব্ল্যাক অ্যারো
ট্রেজার আইল্যান্ড
ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড
দ্য বটল ইম্প

জুলে ভার্ণের
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ
রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ
লাইটহাউস

ওয়াল্টার স্কট-এর
রব রয়
আইভ্যান হো
ট্যালিসম্যান
দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

জেমস কুপারের
দ্য লাস্ট অব দি মহিক্যান্‌স্‌
দ্য পাথ ফাইন্ডার

জর্জ এলিয়টের
মিড্‌ল মার্চ
সাইলাস মার্নার

আলেকজান্ডার দুমার
থ্রি মাসকেটিয়ার্স
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
দি কন্সপিরেটর্স
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো
ব্ল্যাক টিউলিপ
কাউন্টেস দ্য চার্নি

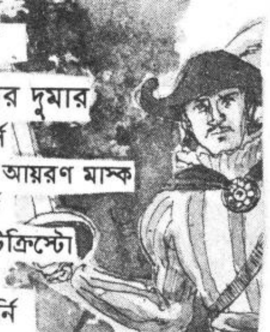

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তোমাদের পাতা

আমাদের দেশ

এই আমাদের দেশ
রূপের নাইকো শেষ।
চাঁদের জোছনায়,
প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

সবুজ মায়ের কোলে
ধানের শিশু দোলে।
অলির গুঞ্জরণ
আকুল করে মন

দীপান্বিতা বসু
বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী
রামপুরহাট উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

দেবজ্যোতি নাথ, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
সাউথ পয়েন্ট স্কুল, গৌহাটি

ঐ দূরে ঐ তালগাছে যে

ঐ দূরে ঐ তালগাছে যে,
মস্ত একটা ভূত আছে যে,
সেই ভূতটা রাত্রিবেলায়
ঝপ্ করে নদীতে ঝাঁপায়।
তখন সেথায় মাছ ধরতে
যায় যদি কেউ, হবে মরতে।
তাই তো বলি ভাই,
ওখানে যেতে নাই,
আমার কথায় কান না দিলে
প্রাণের আশা নাই।

অর্পণ দাস
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী
সিউড়ি, বারুইপাড়া

দীপালী দত্ত, সপ্তম শ্রেণী
মোক্ষদা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ভাগলপুর, বিহার

শম্পা সাহা
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
হাতিবাগান টাউন স্কুল

প্রশ্ন

বলতে পারো কাকের কেন
রঙটি যে হয় কালো?
রাতে চন্দ্র, দিনে সূর্য
দেয় কেন যে আলো?
বলতে পারো পাখির কেন
আছে দুটি পাখা?
রামধনুতে আছে কেন
সাতটি রঙই আঁকা?
শীতের দিনে তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যে কেন হয়?
খেলাধুলো ফেলে তখন
ঘরে ফিরতে হয়?

অনন্যা চক্রবর্তী
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
বড়িশা বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা

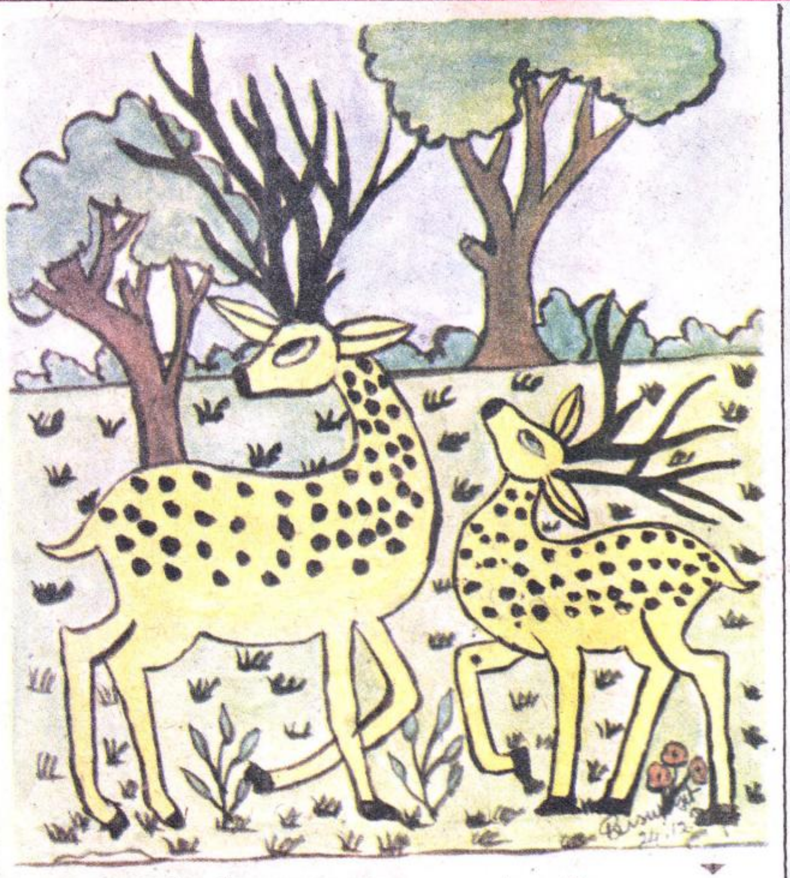

বিশ্বজিৎ সরকার বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
হরিণাভি ভি. ভি. এ. এস. হাই স্কুল, রাজপুর

রাজেশ পাল, বয়স বারো,
অষ্টম শ্রেণী, বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়

রীনার স্বপ্ন

সকাল হতেই মা চেঁচাচ্ছেন, রীনা ওঠ রে।

ও রীনা, রীনা।

রীনার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছিল ও! দেখছিল, সে এবার অঙ্ক পরীক্ষায় ডাহা ফেল।

রীনার বয়স আট। ওয়ান থেকে টুতে উঠবে ও। এরকম খারাপ স্বপ্ন, তার ওপর মায়ের চেঁচামেচি, কার না মেজাজ গরম হয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ওর বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। ভোরবেলার স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! তবে কি সে এবার সত্যি সত্যিই ফেল করবে!

একবার রীনার দাদু নাকি ভোরবেলা স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি একটা মোহর পেয়েছেন। তাই সত্যি হলো! আপিস থেকে আসার পথে রাস্তায় একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। সেই মোহর বিক্রি করে টাকা দিয়ে ঠাম্মা আর পিসির গয়না কিনে দিলেন।

রীনা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে মুখটুখ না ধুয়ে পড়তে বসে গেল। মা বলল, এখন কি পড়ার সময়! চল্, মুখ ধুয়ে নে।

রীনা বলল, যাচ্ছি তুমি যাও।

ইস্কুলে গিয়ে রীনার ভয় করতে লাগল। দিদিমণি মিস সুজাতা দেবী যখন পরীক্ষার কাগজ দিচ্ছিলেন, তখন রীনা দিদিমণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দিদিমণিও কিছু বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

পরীক্ষার ঘন্টা পড়ে গেল। দিদিমণি রীনার হাতে কাগজ দিয়ে বললেন হাঁ করে দেখছিস কি? কাগজটা নিবি তো?

রীনার অবস্থা কাহিল! পরীক্ষার কাগজে নিজের নাম লিখতে গিয়ে লিখে দিচ্ছিল রাধা রায়!

প্রশ্ন দেখে রীনা ভাবল, এসব অঙ্ক ক্লাস ফোরের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া আর কেউই করতে পারবে না। তাই ও দিদিমণিকে বলল, আমি এই অঙ্কগুলো পারছি না। একটু বলে দেবেন?

বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা ওর কথা শুনে হাসতে লাগল। দিদিমণিও ভীষণ রাগে বললেন, যেটা পারবে সেটা করবে। এটা পরীক্ষার সময়।

যাই হোক, ভুলভাল সব অঙ্ক কষে খাতা জমা দিয়ে ফেলল ও। আর রেজাল্ট বেরোতেই দেখা গেল ডাহা ফেল।

বাবা তো খুব রেগে গেলেন।

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটল। রীনা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। তখনি বুঝতে পারল, যা দেখেছে ওতা স্বপ্ন।

হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বসল ও। বলল, ও মা, খেতে দাও, ইস্কুলে যেতে হবে। কিন্তু এ কি! টেবিলের ওপরে দুটো নতুন গল্পের বই! লাল ফিতেয় বাঁধা!

এমন সময় বাবা ঘরে এসে বলল, এই যে রীনা, খুব তো ঘুমোলে। ডেকে ডেকে সাড়া নেই। মিতালী এসে তোমার রেজাল্ট দিয়ে গেল। তুমি সবার থেকে ভাল নম্বর পেয়েছ।

শুনে রীনা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ইন্দ্রাণী ভৌমিক বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
বেথুন স্কুল, কলকাতা।

না, না, না, আমি কিছুতেই খাব না।

হঠাৎ ছেলের এই জেদ দেখে মা বলেন, কেন খাবি না কেন? কি হয়েছে তোর?

বলছি তো খাব না। বলেই মনোমোহন ভাতের থালাটা উল্টে দেয়।

ও কি করলি? থালা উল্টে দিলি কেন?

দেব না তো কি? আমাকে কিছু না দিয়ে সব ওদের দেবে, আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, থালা উল্টে দিলি কেন?

কি দিইনি তোকে? আজ যা যা রান্না হয়েছে সবই তো তোকে দিয়েছি।

সবই দিয়েছো?

দিয়েছিই তো। তরকারি, মাছ, টক—সব।

তাহলে ওর পাতে ওটা কি?

মা শ্যামাসুন্দরী দেবী তাকিয়ে দেখেন ছেলে তার ছোটবোনের পাতের মাছের মুড়োর দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। ছেলের রাগের কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারেন তিনি। বলেন, কি করব বল, তোর ছোটবোন একদিন বায়না ধরল,

নন্দলাল ভট্টাচার্য

তাই আজ মুড়োটা ওকে দিয়েছি। রোজই তো তোকে দি। আজ ও খাক না।

না, খাবে না। ওটা আমার।

বেশ তো। আজকের দিনটা মেনে নে। কাল থেকে আর আমার ভুল হবে না। লক্ষ্মী বাপ আমার, আজকের মতো মুড়ো ছাড়াই খেয়ে নে। আমি আবার ভাত দিচ্ছি।

মনে থাকে যেন। আজকের মতো ছেড়ে দিলাম। এরপর এরকম হলে একদম কুরুক্ষেত্র করব।

না, না, বাবা। আর এমন ভুল হবে না। শুধু আজকের দিনটা।

বেশ, তবে বেশ বড় দেখে মাছটা দাও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি, বলেই শ্যামাসুন্দরী দেবী আবার ছোটেন রান্নাঘরে।

শ্যামাসুন্দরী দেবীর এই হয়েছে এক বিপদ। চার মেয়ের সংসারে সবেধন নীলমণি তাঁর ওই মনোমোহন। এমনিতে ভালই, কিন্তু বড্ড জেদি। বাবা-মার আদর পেয়ে পেয়ে নিজেরটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ওর ধারণা, জগৎ সংসারে যত কিছু ভাল আছে সবকিছুতেই ওর অধিকার। তাই বোনেদের কিছু দিতে দেখলে ক্ষেপে যেত ও। অথচ বোনেদের যে ভালবাসে না তা নয়। বরং খুব বেশিই ভালবাসে। কিন্তু ওই এক কথা। সেরা জিনিসটি আমায় দিতে হবে। তারপর ইচ্ছে হয়, আমি ওদের দেব। তোমরা দিতে পারবে না কিছুতেই।

মনোমোহনের বাবা ভুবনমোহন মিত্র। নামকরা ডাক্তার। ছাত্র হিসেবেও ছিলেন খুবই ভাল। কলকাতা মেডিকেল

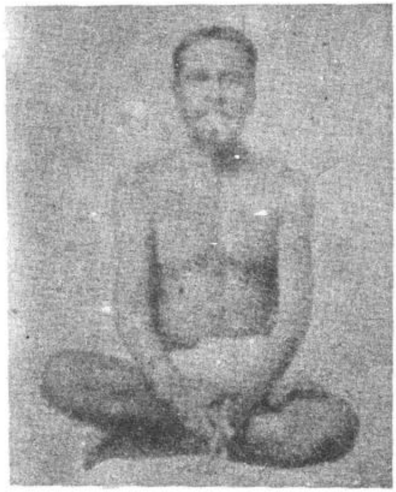

কলেজ থেকে অনেকবার সোনার মেডেলও পেয়েছেন।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের স্পেশাল ভ্যাকসিনেশন অফিসার হিসেবে পাঞ্জাবে দশটা বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর কাজে খুশি হয়ে ভারত সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাবও দেন।

সব মিলিয়ে ভুবনমোহন যেমন নামী ডাক্তার তেমনি রোজগারও করেন দেদার। ছেলেকে তিনি ভালওবাসেন খুব। তার কোনো আবদারই অপূর্ণ রাখেন না তিনি।

মা শ্যামাসুন্দরীও তাই। ফলে মনোমোহন আদরে আদরে একটু বাঁদর গোছের হয়ে পড়ে। যখন যেমন খুশি পয়সাও পেত সে বাবা-মার কাছ থেকে। আর তাই দিয়ে বাজার থেকে কিনে খেত আজেবাজে খাবার। বাবা-মা ব্যাপারটা জানলেও বকাঝকা করেননি কখনও।

বাবা-মা কিছু না বললেও, শরীরে সইবে কেন? ওসব বাজে খাবার খেয়ে লিভারের বেশ শক্ত ব্যামো বাধিয়ে বসে মনোমোহন।

ভুবনমোহন নিজে ডাক্তার, কিন্তু ছেলের চিকিৎসা নিজে না করে বড় বড় ডাক্তার এনে দেখাতে লাগলেন। তাঁরা দেখেশুনে মতামত দিলেন ভাল ভাল পথ্যের। সেই সঙ্গে চলতে থাকল চিকিৎসা।

মা শ্যামাসুন্দরী সবকিছু ফেলে তখন দিনরাত্তির বসে থাকতেন ছেলের পাশে।

চিকিৎসা আর পথ্যের গুণে মনোমোহন সুস্থ হয়ে উঠল। ভুবনবাবু তখন স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য তাকে নিয়ে এলেন পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের জল হাওয়ায় মনোমোহন একবারে সুস্থ হয়ে উঠল।

ভুবনবাবুও ছেলেকে নিয়ে আবার চলে এলেন কোন্নগরে। এখানে থাকতেন তাঁর বাবা জগৎচন্দ্র মিত্র। তাঁর কাছেই ছেলেকে রেখে তিনি একা ফিরে যান পাঞ্জাবে।

এক ছেলে বলে সবার আদর পেয়ে আর অসুখে প্রায় মরমর হয়ে বেঁচে যাওয়াতে মনোমোহনের বায়না যেন আরো বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে সে হয়ে উঠল বড় অভিমানী। পরিণত বয়সেও তার এই অভিমান যায়নি।

বড় হয়ে মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তাঁর সামনে অন্য কাউকে ভাল বলা যাবে না। এই নিয়েই ঘটেছিল একটা ঘটনা—আর তা থেকেই কিন্তু দূর হয় মনোমোহনের এই অভিমানবোধ।

সেদিন মনোমোহনের সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণ একজনের ভক্তির প্রশংসা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আঁতে ঘা লাগে মনোমোহনের। ধারণা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চেয়ে অন্যকে বেশি ভালবাসেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন ঠিক করেন, তিনি আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবেনই না। আর সেইমত দক্ষিণেশ্বরে আসা বন্ধ করে দেন তিনি।

রবিবার দিন মনোমোহন না আসায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের জিজ্ঞেস করেন মনোমোহন এল না কেন? তার আবার কি হলো? পরদিনই শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মনোমোহনের মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত তাঁর অফিসে এসে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কাল দক্ষিণেশ্বরে যাওনি কেন? ঠাকুর তোমার খোঁজ করছিলেন।

আমার খোঁজ করে কি হবে? তিনি থাকুন তাঁর ভক্তদের নিয়ে। আমার আগে ভক্তি হোক, তারপর যাব এখন।

রামচন্দ্র জানতেন মনোমোহনকে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলে আসেন।

অভিমানের বশে মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে না গেলেও কোনো কাজে কিন্তু মন লাগাতে পারেন না। তাঁর সমস্ত মন পড়ে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই। সব বুঝতে পারেন তিনি, কিন্তু অভিমান ভাঙে না—তাই দক্ষিণেশ্বরেও যান না।

সেদিন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে নৌকোয় দেখেন বলরাম বসুকে। দেখেই বলেন, আজ দিনটা ভাল যাবে, একজন মহাভক্তের দর্শন পেলুম।

বলরাম বসু কিন্তু বলেন, শুধু ভক্ত নন, ঠাকুরও আছেন নৌকোতে। ঠাকুরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতন্ময় হয়ে পড়েন মনোমোহন। তিনি এগিয়ে যান ঠাকুরের কাছে। তাঁকে প্রণাম করে তিনি যেন টলতে থাকেন। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন, কিগো, আছ কেমন? তোমার জন্য যে বড় ভাবনা হচ্ছিল, তাই নিজেই চলে এলুম।

ঠাকুরের এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন মনোমোহন। বলেন, অভিমান—আমার অভিমানে বড় ঘা পড়েছিল। আমার অভিমান আপনি দূর করে দিন।

সে কথায় ঠাকুর হাসতে থাকেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন হয় আবার। আর তারপর থেকে মনোমোহনের অভিমানও দূর হয়।

এসব অবশ্য অনেক পরের কথা। কোন্নগরে ঠাকুর্দার কাছে তখন রয়েছে মনোমোহন। বয়সও হলো বছর বারো। ঠাকুর্দা জগৎ মিত্র তাই তাকে ভর্তি করে দিলেন সেখানকারই একটি স্কুলে।

ব্যাপারটা কিন্তু তেমন মনঃপূত হলো না ভুবনমোহন মিত্রের। তিনি একজন রায়বাহাদুর। সমাজে তাঁর কত খাতির। আর তাঁর ছেলে কিনা পড়বে কোন্নগরের মতো একটা পাড়াগাঁয়ের সাধারণ একটা স্কুলে! না না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। ভুবনমোহন চান, ছেলে তাঁর আভিজাত্যের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে মানুষ হোক। সে যে সাধারণ নয়, এই কথাটা ওই বয়স থেকেই গেঁথে যাক তার মনে। তাই মনোমোহনকে তিনি নিয়ে এলেন কলকাতায়।

কলকাতার ঝামাপুকুরে থাকতেন মনোমোহনের মেসোমশাই রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। তখন তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে বাংলা সরকারের সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। এই রাজেন মিত্রের বাড়িতেই ছেলেকে রাখলেন ভুবনবাবু।

মেসোমশাইয়ের বাড়িতে সব বড়লোকি চালচলন। তারই মধ্যে থাকতে থাকতে মনোমোহনও রপ্ত করে তা। ভর্তিও হলো হিন্দু স্কুলে। হিন্দু স্কুলে তখন পড়ত সব রাজা-মহারাজ, বড় বড় লোকেদের ছেলে। তাদের সঙ্গে মিশে মনোমোহন নানারকম বড়লোকি চালই শিখতে থাকল, লেখাপড়া তার প্রায় কিছুই এগোলো না।

পড়াশোনা না পারলেও ছেলে যে মনোমোহন খুব খারাপ ছিল তা নয়। বিশেষ করে বেচাল ব্যবহার তাকে কেউ কোনোদিন করতে দেখেনি। আর পড়াশোনায় কোনো পুরস্কার না পেলেও গুড কনডাক্ট-এর প্রাইজটা তার প্রায় বাঁধা ছিল। মাস্টারমশাইরাও ওই একটি কারণেই ভালবাসতেন মনোমোহনকে। একজন মাস্টারমশাই তো ক্লাসে বলেই দিলেন, তোমরা জেনে রাখ, সচ্চরিত্র ছেলেই জীবনে উন্নতি করে। ভবিষ্যতে দেখবে, এই মনোমোহনই তোমাদের অনেককে ডিঙিয়ে যাবে।

মাস্টারমশাইয়ের সেদিনের সেই কথাটা কিন্তু সত্যি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সততার জন্যই মনোমোহন বহু মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাও পেয়েছিলেন ওই সততার জন্যই।

মনোমোহনের মেসোমশাই রাজেন মিত্রের সঙ্গে কেশব সেনের ছিল খুবই খাতির। প্রায়ই কেশব সেন ওই বাড়িতে আসতেন। রাজেনবাবুর সঙ্গে তাঁর ধর্ম নিয়ে নানা আলোচনাও হতো। মনোমোহন বয়সে নেহাতই ছোট। কিন্তু সেসব আলোচনা সভায় সে ছিল নিয়মিত শ্রোতা। মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্যও করত। কেশব সেনও তাকে ভালবাসতেন। এইসব কারণে মনোমোহন ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে পড়াশোনায় আরো ঢিলে পড়ে।

সেকালে খুব অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। তার ওপর মনোমোহন ছিল তার বাবা-মার খুবই আদুরে। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার আগেই মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর ভুবনবাবু ছেলেকে ঢাকায় তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। সেখান থেকেই মনোমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ

করে। তারপর আবার কলকাতায়। উদ্দেশ্য কলেজে পড়া।

কিন্তু এই সময়েই মনোমোহনের জীবনে নেমে আসে দুর্ভাগ্য। তার বাবা হঠাৎ-ই মারা যান। ভুবনবাবু রোজগার প্রচুর করলেও খরচের ব্যাপারে ছিলেন খুবই হাতখোলা। তাই জমানো টাকা প্রায় কিছুই ছিল না।

শ্যামাসুন্দরী দেবী সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। সংসারের ভার পড়ল মনোমোহনের ওপর। কিন্তু তার কোনো রোজগার নেই। চেষ্টাচরিত্র করেও একটা চাকরি যোগাড় করতে না পেরে সে যেন চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

কলকাতায় এসে রাজেন মিত্রের সহায়তায় তাঁরা একটা বাড়ি কেনেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই শ্যামাসুন্দরী দেবী দেখেন, কলকাতায় খরচ অনেক। তার চেয়ে গ্রামে গিয়ে থাকলে খরচ অনেক কম লাগবে। কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে তিনি সব নিয়ে চলে আসেন আবার কোন্নগরেই। মনোমোহনও সেখানে বাবার বইপত্তর নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে। কিছুদিন পরে মেসোমশাই রাজেন মিত্র তাকে বেংগল সেক্রেটারিয়েটে ৪০ টাকা মাইনের একটা চাকরি যোগাড় করে দেন। মনোমোহন কোন্নগর থেকেই অফিসে যাতায়াত করতে থাকে।

ঠিক এই সময়ে মনোমোহনের জীবনে নেমে আসে আরো একটি আঘাত। তার সাত মাস বয়সের একটি মেয়ে মারা যায়। মেয়েটিকে মনোমোহন খুবই ভালবাসত। মেয়ের মৃত্যুতে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। দিনরাত শ্মশানে গিয়ে কান্নাকাটি করে। কাজেও মন নেই আর। সবসময় শুধু মেয়ের জন্য হা-হুতাশ।

ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে যান শ্যামাসুন্দরী দেবী। তিনি সবাইকে নিয়ে আবার কলকাতাতেই ফিরে আসেন। এখানে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে থেকে মনোমোহন শোক যেন কিছুটা ভোলে। তার এক অন্তরংগ বন্ধু রাজমোহন সে সময় ব্রাহ্মসমাজে যেত। তার সংগে মনোমোহনও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতে থাকে—উপাসনাতেও বসে।

মনোমোহনের মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত বিজ্ঞান পড়া মানুষ। ভগবান-টগবানে তখনও কোনো বিশ্বাস নেই। রামচন্দ্রই বাধা দিল মনোমোহনের উপাসনায়। বলল, ওসব করে কিছু হবে না।

মনোমোহন পড়ে দোটানায়। রামচন্দ্রর কথাও ফেলতে পারে না, আবার সত্যিই ঈশ্বর আছে কিনা তা জানার জন্যও মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

নানা চিন্তাভাবনায় মাথা গরম হয়ে যায় মনোমোহনের। সে রাতে ওই অবস্থাতেই দেখে এক স্বপ্ন। জলে থৈথৈ করছে চারিদিক। সে জলে ভেসে যাচ্ছে তার মা, বোন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাই। সবাই ভেসে যাচ্ছে দেখে হায় হায় করে ওঠে মনোমোহন। ভাবে, সবাই যদি গেল তাহলে আমার থেকে লাভ কি? আমিও তাহলে—

আত্মহত্যা করবে? আকাশ থেকে কার স্বর ভেসে এল। জান না, আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা করলে আরো অশান্তি পাবে।

মনোমোহন থমকে দাঁড়ায় সেকথা শুনে। বুঝতে পারে না কি করবে। তাই বলে, সবাই যদি মরে গেল তাহলে সংসার করব কাদের নিয়ে!

আবার দৈববাণী। সবাই মরেনি, বেঁচে আছে কয়েকজন। যাঁরা ভগবানকে দেখেছেন বা জেনেছেন এমন কয়েকজন বেঁচে আছেন। তুমি শীঘ্রই তাঁদের দেখা পাবে।

এ কথা শুনতে শুনতেই ঘুম ভেঙে গেল মনোমোহনের। সে তখন কেমন যেন বিহ্বল। ওই অবস্থাতেই চিৎকার করে বলতে থাকে, ওগো, এ আমি কি দেখলাম? ওগো, তোমরা কে কোথায় আর আমিই বা কোথায়?

তার চিৎকারে বাড়ির লোকজন ছুটে আসে। স্বপ্নের কথা শুনে অবাক সবাই।

পরদিনই রামচন্দ্র আসে গোঁসাই নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে। গোঁসাইয়ের সংগে আলোচনা করে মনের দ্বন্দ্ব অনেক কেটে গেল। রাম দত্তও বলে, হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ। অজ্ঞানরূপে তো সবাই মৃত। জ্ঞানীরাই প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকেন। কিন্তু জগতে জ্ঞানী আর ক'জন আছেন বল। আছেন কয়েকজন মাত্র। তাই মৃতই বেশি।

এমন কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যিনি এখনও বেঁচে?

হ্যাঁ, একজন আছেন—দক্ষিণেশ্বরে। নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। চল তাঁর কাছেই যাই।

রাম দত্ত আর মনোমোহন চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণর সংগে কথা বলে খুব ভাল লাগল। তাঁর কাছে যাতায়াত বেড়ে গেল।

মা শ্যামাসুন্দরীও বললেন, অমন সহজ কথায় যিনি ভগবানের বিষয় বোঝাতে পারেন তিনি শুধু জ্ঞানী বা সাধু মহাত্মা নন, তিনি স্বয়ং ভগবান। তোমরা তাঁর কাছে যেও—রোজই যেও।

মায়ের কথায় মনোমোহন প্রায়ই যেতে থাকে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নির্দেশে তাঁরই আদর্শে গড়ে উঠতে থাকে মনোমোহনের জীবন।

ঠাকুর দেহ রাখলে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসী গুরুভাইদের কষ্ট দেখে মনোমোহনই গিরিশচন্দ্রর সংগে উদ্যোগ নিয়ে মঠের জন্য গৃহী ভক্তদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করেন।

বিবেকানন্দর মৃত্যুতে মনোমোহন মনে প্রচন্ড আঘাত পান। পরের বছর ১৯০৩ সালে বিবেকানন্দর জন্মদিনে বেলুড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন মনোমোহন। সন্ন্যাস রোগ। আর তাতেই ৩০ জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন তিনি। মনোমোহনের জন্ম কোন্নগরে ১২৫৮ সালের ২৪ ভাদ্র। ঠাকুরঅন্ত প্রাণ মনোমোহন গৃহে থেকেও যাপন করতেন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন। সেইভাবেই মাত্র ৫২ বছর বয়সে অমৃতের পুত্র ফিরে গেলেন অমৃতের কোলে। পেছনে ফেলে রেখে গেলেন গৃহীর আদর্শ জীবনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

হাঁদা-ভোঁদার
গাড়ি সাফ
একটা ভালো সিনেমা এসেছে, ভোঁদা! চল দেখে আসি।
না, ভাই! আমার পয়সা নেই।
জল কাদা ভর্তি গর্তের ওপর দিয়ে লরি চালিয়ে কাদা ছিটিয়ে আমার গাড়িটার কি অবস্থা করেছে। পরিষ্কার করতে দম বেরিয়ে যাবে।
পিসেমশাইয়ের মেজাজ খারাপ। ওখানে এখন কোন চান্স নেই ...!
আরেঃ! একটা মতলব পেয়েছি। আমি যদি পিসেমশাইয়ের গাড়ির কাদা ধুয়ে সাফ করে দি তাহলে খুশি হয়ে পিসেমশাই সিনেমা দেখতে পয়সা দিতে পারে।
খবরের কাগজটা গাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে আয় তো, হাঁদা!
এই যে, আনছি পিসেমশাই!
ধ্যেৎ! দেখতে পাচ্ছি না তো! ভিতরে খুঁজে দেখি।
এই যে ওটা এখানে। নীচে পড়ে গিয়েছিলো।
এই হোস দিয়ে আমি খুব জলদি কাদা সাফ করে পিসেমশাইয়ের মেজাজ খোশ করে দেবো।
মরেচে! জানালা যে খোলা!

গরর! আমার সঙ্গে এটা কি রসিকতা হলো?
মরেচে! আমি এটা দিয়ে গাড়ির কাদা সাফ করতে গিয়েছিলাম।
ধড়াম!
আমাকে ভিজিয়ে, আছাড় খাইয়ে তুই পালাবি কোথায়?
পোস্টকার্ড বলছে উত্তরে খুব বৃষ্টি। এখানে তো সুন্দর আর শুকনো!
মরেচে! হাঁদা আমাকে ভেজাতে চাইছে!
এই দ্যাখ্ পাল্টা!... ওঁক্স্!
ঠিক সময়ে গোঁত্তা মেরেছি!
সিনেমায় যাবার আর প্রয়োজন নেই! এখানেই প্রচুর চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছে! হিঃ হিঃ!
গরর!
দুম! গুম!

রাক্ষসের দেশে টারজান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সব্যসাচী

পাতালকূপ থেকে বেরিয়ে ট্যান্টরের পিঠে চেপে টারজান আর সেইমুন্ডা যখন নাংলা-গ্রামের নিচে মাঠের ভিতর দেখা দিল তখন মূর্দাহারু ছাড়া অন্য সকলেই ভীত, চিন্তিত, উত্তেজিত হয়ে উঠল অল্পাধিক পরিমাণে। মূর্দাহারু নাংলায় এসে ঢুকেছিল প্রায় হতজ্ঞান অবস্থায়, এখনও তাই আছে। নাংলারা খবর পাঠিয়েছে ভূলাংয়ে। সেখান থেকে লোক এসেছে কয়েকজন। তারা করছে রোগীর পরিচর্যা, কিন্তু তাকে পাহারা দিচ্ছে নাংলাবাসীরা। অর্থাৎ মূর্দাহারু কার্যতঃ বন্দী। একটা গুহাতে তাকে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। গুহার চাইতে মূর্দাহারুর দেহ আয়তনে বড়। প্রস্থে না হোক, দৈর্ঘ্যে তো বটেই। ডাইনের নির্দেশমতো ওষুধ খাওয়ানো কি সম্ভব হবে মূর্দাহারুকে? গুরুতর সন্দেহ ছিল টারজানের, তথা সেইমুন্ডার মনে। তাছাড়া ভূলাং থেকে এসেছে যারা সব মূর্দাহারুর আপনজন, তাদের মতামতের উপরেও নির্ভর করবে অনেকখানি।

মনে প্রবল সন্দেহ। তবু ঋষিকল্প ডাইনের উপরে আস্থা, সেইমুন্ডার তো প্রগাঢ় হতেই পারে। তাকে চর্মচক্ষে দেখে আসার পরে টারজানেরও এখন কম নয়। দীর্ঘ যুগ সে আফ্রিকায় বাস করছে। এইটিই তার দ্বিতীয় পিতৃভূমি বলা চলে। এখানে সে দেখেছে বহু বিচিত্র জিনিস, অর্জন করেছে আশ্চর্য রকমের সব অভিজ্ঞতা। কিন্তু সারা আফ্রিকা চক্কোর দেওয়ার কালে তার এমন আর একটি মানুষ চোখে পড়েনি। ভারতের যোগীদের কথা সে শুনেছে। ইউরোপে মহামান্য পোপকে সে নিজের চোখেই দেখেছে। অভিভূত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং দেবদূতপ্রতিম আবরণ-মাধুর্যে। আজ সেই সব কথাই মনে পড়ছে টারজানের। কোনো সাদৃশ্যই নেই পৃথিবীস্তুত সেই খৃষ্টান ধর্মগুরু আর অরণ্যবাসী অখ্যাত অজ্ঞাত এই কাফ্রী সাধকের মধ্যে, তবু–তবু–কোথায় যেন একটা আভাস পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক ঐক্যের, যার স্বরূপ উপলব্ধি করার মতো শিক্ষাদীক্ষা টারজানেরও নেই।

সেইমুন্ডাকে দেখে নাংলা যোদ্ধারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল! নারিহাল তো ছুটে এসে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। "কী করে বেরুলে? পাথর উঠল কীভাবে? আমরা ভাবছিলাম লোকজন দড়িদড়া নিয়ে এক্ষুণি আবার যাব সেখানে। কিন্তু এখানে মূর্দাহারুর এই অবস্থা, তার দেশ থেকে লোকজন এল, কাংলাকে অরক্ষিত রেখে–"

সেইমুন্ডা তার কথায় মনোযোগ না দিয়ে ভূলাংয়ের যোদ্ধাদের বলতে লাগল সুড়ংগসান্নিধ্যে ধর্মগুরু ডাইনের গোপন আশ্রমের কথা। ডাইন যে ঔষধ দিয়েছেন মূর্দাহারুকে নিরাময় করবার জন্য, সে-কথাও বলল, এবং সর্বশেষে জিজ্ঞাসা করল–"আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে তো? মহারাক্ষস মূর্দাহারু টারজানের সংগে যুদ্ধে ভয়ানক জখম

হলো যখন, তখন আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিল, অন্য কোথাও নয়, তার গুরু বিরঙ্গ ডাইনের কাছে। দুনিয়ার লোক জানে যে ডাইন বিরঙ্গ আটলাস পর্বতে থাকেন। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। তিনি থাকেন আমাদের অতি নিকটে এক গোপন আশ্রমে। দুর্ভাগ্য তার, এত রক্ত তার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে কূপের প্রাচীরে ধাক্কা দিয়ে রুদ্ধ এবং অদৃশ্য দ্বার সে মুক্ত করতে পারেনি। তাইতেই সে সাক্ষাৎ পায়নি গুরুর। যা হোক, টারমাঙ্গানি বন্ধু টারজানের সঙ্গে গিয়ে আমি সাক্ষাৎ করেছি গুরুর সঙ্গে"—বলল সেইমুন্ডা, "ঔষধ এনেছি মূর্দাহারুর জন্য, আমাদের কাফ্রী জাতির বীর শিরোমণি তো উনিই। ওঁকে জীবিত রাখার জন্য সর্বরকম চেষ্টা আমরা সকলেই করব।"

ততক্ষণে গুরু বিরঙ্গের চিন্তাতরঙ্গ এসে ভূলাংবাসীদের মনে আস্থা সঞ্চার করেছে ঔষধ সম্বন্ধে, তারা কোনো আপত্তি না করে মূর্দাহারুকে ওষুধ খাওয়ানোর অনুমতি দিল। ঔষধ খাওয়াল নিজে সেইমুন্ডা, মূর্দাহারুর প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতির নেত্রী।

টারজান এখানে আর অপেক্ষা করেনি। যেখানে তার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় নয়, সেখানে সে এক মুহূর্তও থাকতে রাজী নয়। ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সে মাঠে নেমে গিয়েছে, উঠে গিয়েছে ট্যান্টরের পিঠে। জানে যে, মূর্দাহারুকে ঔষধ সেবন করানো হলেই সেইমুন্ডা তার কাছে একবার আসবে অবশ্যই, তখন সে বিদায় নেবে এই নরখাদকদের দেশ থেকে। এখানে থাকার তো কোনো প্রয়োজনই নেই তার! ডাইন বিরঙ্গ যা বলেছেন, সুস্থ হয়ে ওঠার পরে মূর্দাহারু যদি চিত্তসংযমের জন্য দ্বিতীয় পর্যায় তপস্যায় বসতে রাজী হয়, কাফ্রীভূমির হানাহানি আত্মকলহ তো তাহলে চিরতরে লুপ্ত হবে। এ দেশ হবে শান্তির দেশ, নরমাংসের লোভ পরিহার

মুগুর প্রথম পড়ল জুড়াকেরই মাথায়।

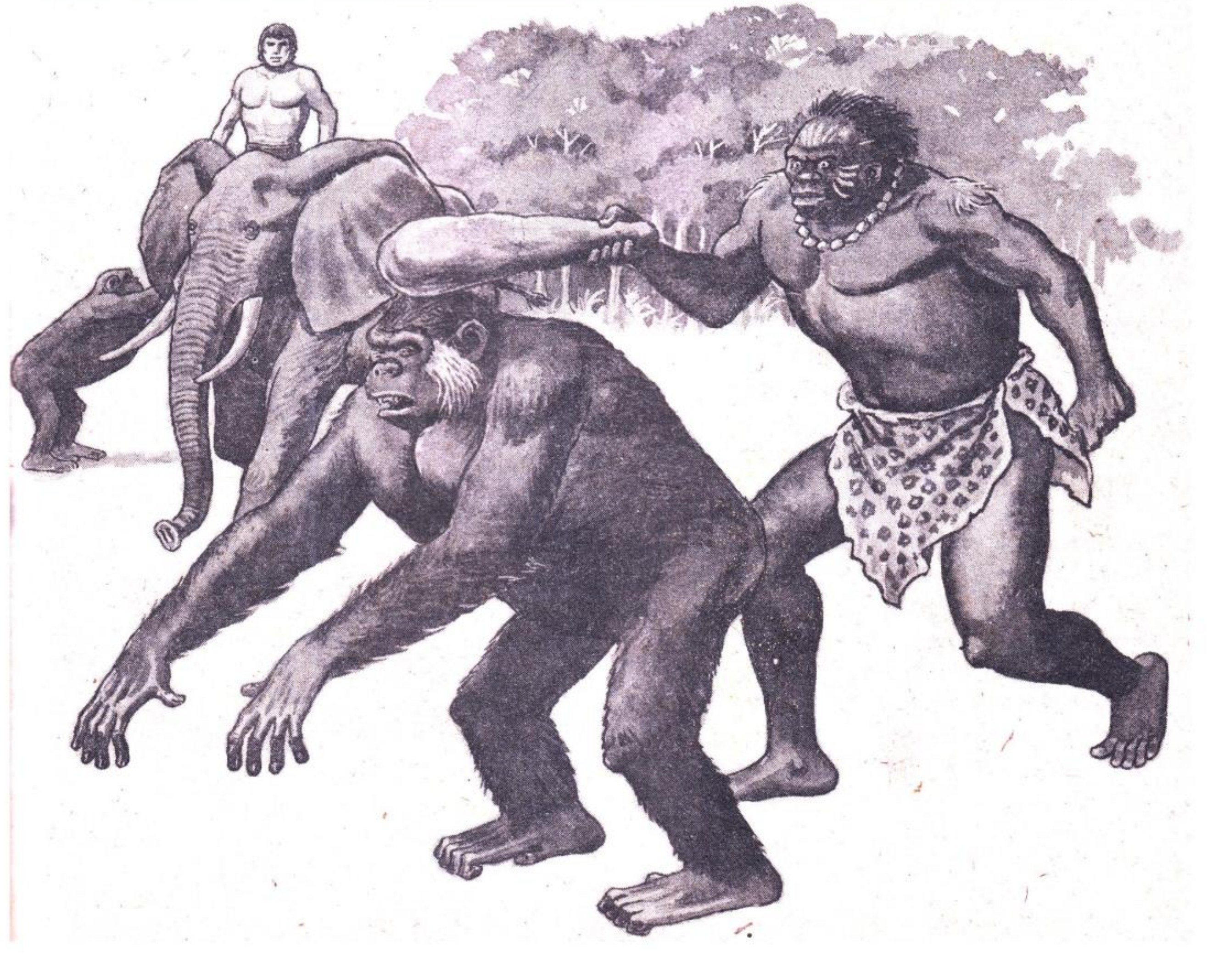

করে তারা নরনারী মাত্রকেই আত্মীয় বলে বুকে টেনে নেবে।

সবই হয়ে যাবে কালচক্রের আবর্তনে। টারজান এখানে করবে কী? কাফ্রী জাতির ভাগ্যবিধাতা তাকে এদেশে টেনে এনেছিলেন শুধু শক্তিমদমত্ত মূর্দাহারুর দর্পচূর্ণ করতে, তাকে এই শিক্ষা দিতে যে শক্তিমান যদি সংযমী না হয়, তার চেয়েও বড় শক্তিমানের হাতে সে অচিরে পর্যুদস্ত হবে।

মাঠের ভিতর ট্যান্টরের পিঠে বসে নাংলা পল্লীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে টারজান, হঠাৎ তার মনে হলো, পিছনের অরণ্যে বহু বিশাল বিশাল প্রাণীর সমাবেশ হয়েছে একস্থানে। যাকে বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এ সেই অদৃশ্য শক্তি। বিপদকালে এই ষষ্ঠেন্দ্রিয় চিরদিনই সতর্ক করে দিয়ে থাকে টারজানকে।

সে ফিরে তাকাল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভুল খবর দেয়নি তাকে, একদল মহাকপি। জুডাকের দলে যারা ছিল তার বিশেষ অনুরক্ত, তারাই ধেয়ে আসছে জুডাকের নেতৃত্বে। ক্যাগোডা করার পরেও জুডাক পরাজয়ের গ্লানির জ্বালায় জ্বলছে। টারজানকে মাঠের মধ্যে একা পেয়ে সে ভেবেছে, প্রতিশোধ নেবার এই হলো উৎকৃষ্ট সুযোগ। সে বিশ-পঁচিশটা অতি বলীয়ান মহাকপি সঙ্গে নিয়ে ধেয়ে আসছে টারজানকে লক্ষ্য করে।

টারজানের পক্ষে বিপদের কথা বই কি! মূর্দাহারুর সঙ্গে সেই যে যুদ্ধ হয়েছিল, তখনই তার তীর-ধনু-বল্লম পড়ে গিয়েছিল কাঁধ থেকে, তারপর এখনও দ্বিতীয় প্রস্থ সংগ্রহ করে নেবার সময় হয়নি। থাকার মধ্যে আছে তার কটিলগ্ন ভোজালিখানা। তাই নিয়ে কি এতগুলি দানবের মোকাবিলা করা সম্ভব? অরণ্যের পথ রুদ্ধ, সেদিক থেকেই আসছে জুডাকেরা। একমাত্র আশ্রয় ঐ নাংলা পল্লীতে। কিন্তু তারা তো এখন নিজেরা ব্যস্ত নিজেদের জরুরী ব্যাপার নিয়ে। জরুরী ব্যাপার! কাফ্রী জাতির ভবিষ্যৎ! মূর্দাহারুর জীবনমৃত্যুর সমস্যা।

ট্যান্টর নিজের ভাষায় চুপিচুপি বলছে—"ট্রিয়াং-টি—পালাব? কোনদিকে?"

"গ্রামের দিকেই চল—" বলল টারজান। মহাকপিরা ওদিকে এসেই পড়েছে। গ্রামের দিকে যাওয়ার আদেশ টারজান দিয়েছে বটে, কিন্তু সে আদেশ ট্যান্টর পালন করবে কেমন করে? পাহাড়ের গায়ে ওঠা তো তার সাধ্যাতীত? পাহাড়ের নীচে তাকে হবেই থামতে।

টারজান একা হলে দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠত। কিন্তু ট্যান্টরকে বিপদের মাঝখানে রেখে সে নিজেকে নিরাপদ করার চেষ্টা কেমন করে করবে?

ট্যান্টর আগে থেকেই আহত; ভুলাং যুদ্ধে কম রক্ত তো তার ঝরেনি! তবু সে যথাশক্তি ছুটছে। ছুটছে মহাকপিরাও, যদিও তাদের দেহগুলো দ্রুত ধাবনের উপযোগী নয়। দেখতে দেখতে ট্যান্টরকে ঘিরে ফেলল মহাকপিরা। কেউ টারজানের পা ধরে টানতে লাগল, কেউ ট্যান্টরের লেজ বেয়ে পিঠে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

টারজান এখনো অক্ষত বটে, কিন্তু কতক্ষণ থাকবে অক্ষত? টারজান যে টারজান, সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। লাফিয়ে পড়ে দৌড় দিলে সে বাঁচতে পারে, কারণ কপিরা তার মতো দৌড়তে পারবে না। কিন্তু তাহলে ট্যান্টর? ট্যান্টরও দৌড়তে পারে ঠিকই, কিন্তু ততটা দৌড় কপিরাও পারে দৌড়তে।

হঠাৎ—

নাংলা গ্রামে একটা অট্টরোল।

মুগ্দার হাতে মূর্দাহারু ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় এক ট্যান্টরের মতো। ডাইনের ঔষধের গুণে সে উঠে বসেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ। এক পলক তাকিয়ে দেখেছে মাঠের ভিতরকার তাণ্ডব। তারপরই তারই মুগুরখানা নাংলারা এনে ফেলে রেখেছিল নাংলার পথের পাশে, সেইটি তুলে নিয়ে মূর্দাহারু ছুটল মাঠের দিকে।

কে তখন বলবে যে এই মূর্দাহারু ক্ষণপূর্বেও মৃত্যুশয্যায় শুয়েছিল?

মহাকপিরা ওদিকে দৃষ্টি দেয়নি। তারা সবাই টারজানকে হত্যা করার নেশায় মত্ত। মূর্দাহারুর মুগুর প্রথম পড়ল জুডাকেরই মাথায়।

আর দুই-চার মহাকপি ধরাশায়ী হওয়ার পরে বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালাল। টারজান ট্যান্টরের পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গেল মূর্দাহারুর দিকে। তার হাত ধরে বলল—"তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?"

বোকার মতো হেসে মূর্দাহারু বলল—"তা তো জানি না। গুরু যেন কানে কানে বললেন—'তোর বন্ধুকে যে ওরা মেরে ফেলছে! ওঠ! ওঠ!' আমি তাই উঠলাম, মুগুর নিয়ে ছুটে এলাম!"

মূর্দাহারুকে অবাক করে দিয়ে এবার টারজান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

—শেষ—

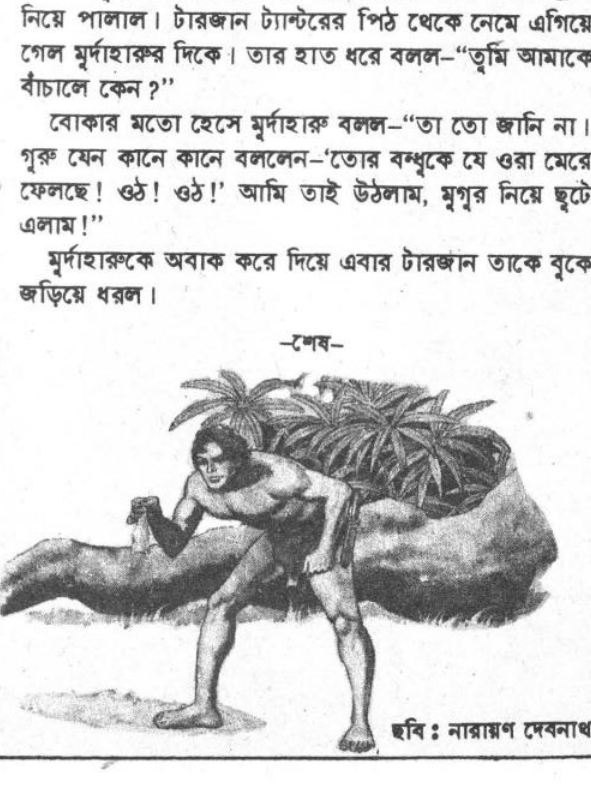

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

নতুন ধাঁধা

[১] শেষের দুইয়ে রঙ,
আর প্রথম তিনে মণি
বিখ্যাত এক ব্যক্তি তিনি
মোরা সবাই জানি।

–প্রশান্ত কুন্ডু/সৌমেন পাল
গৈরা, পুরন্দরপুর, বাঁকুড়া

[২] কোল-এর মাঝে কী বসাবে?
বসন্তেয় দেখা পাবে।

–মিলন সেন
ডাঙালি কালীতলা, বোলপুর

[৩] শেষ ছাড়ি কর্ম
ঐ কর্মই মোর পেশা
আদিঅন্তে তীর্থস্থান
ভাগ্যে থাকলে দেখা।

–প্রণবকুমার সেন
পোঃ+গ্রাম: মালিয়াড়া, বাঁকুড়া

[৪] ফলের মধ্যে আর এক ফল
বল তো একী আজব?
একই রান্নায় দুটিই সফল
সব শেষে দেখি শব।

–শ্রীধর সামন্ত ও
সৌরভ সামন্ত
গ্রাম: কাখুরিয়া বাড়ি
মেদিনীপুর

কার্তিক সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর–১.পাপড়ি, ২.বাজনা, ৩.প্রধান, ৪.মৃগয়া

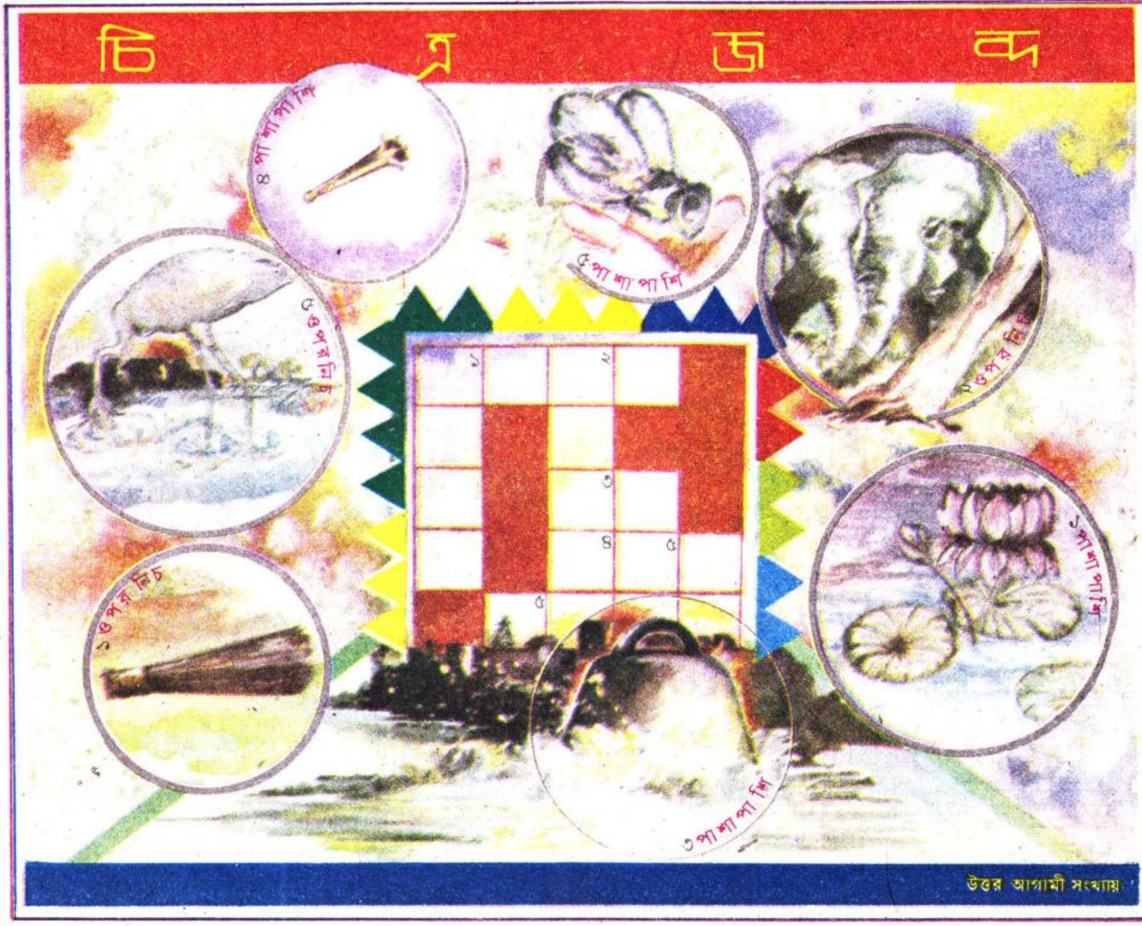

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

জ্যাকসনের শাস্তি

শিশিরকুমার মজুমদার

১৯০৭ সালের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় এক রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখেন অরবিন্দ। তার জের টেনে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকী আত্মবলি দেন আলিপুর বোমার মামলায় বহু বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়। প্রায় উন্মাদের মতোই বৃটিশ রাজশক্তি বিপ্লবীদের উপরে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে গোটা দেশ জুড়ে। অবস্থা তাদের এমনই যে, কে বিপ্লবী আর কে নয়, তা বিচার করার ক্ষমতা পর্যন্ত তখন তাদের লোপ পেয়েছে।

বোম্বাইয়ের নাসিক শহরেও তখন বিপ্লবীদের এক শক্ত ঘাঁটি ছিল। তবে প্রকাশ্যে এক সংগঠন ছিল, তার নাম 'মিত্র-মেলা।' মিত্রমেলা সংগঠন চালাতেন গণেশ দামোদর সাভারকর। এঁরই ছোট ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকর তখন ইংলন্ডের ইন্ডিয়া হাউসে থেকে বিপ্লববাদের শিক্ষা নিচ্ছিলেন।

আলিপুর বোমার মামলা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লর আত্মদান

ভীষণভাবে মাতিয়ে দিল দেশের বিপ্লবীদের। মিত্রমেলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে গড়ে উঠল গোপন বিপ্লবী সংস্থা, 'অভিনব ভারত সংঘ'। এরও প্রধান গণেশ দামোদর সাভারকর। দলের ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য গণেশ দামোদর দেশাত্মবোধক একটা গানের বই লিখলেন। সেই গান গেয়ে দেশের ছেলেরা মেতে উঠল। বিপদ গুনল বৃটিশ সরকার। গণেশ দামোদরকে গ্রেপ্তার করা হলো রাজদ্রোহের অভিযোগে।

সবাই ভেবেছিল, গান লেখার জন্য কি আর এমন সাজা হবে। কিন্তু ইংরাজ সরকারের আদালতে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে বৃটিশ সরকার জানায়, তাঁর বাড়ি তল্লাসি করার সময়, ফরাসী দেশ থেকে হেমচন্দ্র কানুনগোর আনা বোমা তৈরির বইএর একটা অনুলিপি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেছে গণেশ সাভারকর ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। গণেশ সাভারকর আপিল করলেন। কিন্তু তাঁর এই সাজা বহাল রইল। ইংরাজ সরকারের এই ছিল ন্যায় বিচারের নমুনা!

বিপ্লবীরা ক্ষেপে উঠলেন। এর যোগ্য উত্তর দিতেই হবে। আর তা শুধু দেওয়া যাবে নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খতম করেই। সেই তো এই সাজা দিয়েছে। গোপন আলোচনা সভায় ঠিক হলো অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে, কার্ভে আর দেশপাণ্ডে যাবেন। তাঁরাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবেন।

নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জ্যাকসন। এ দেশের মানুষদের তিনি মানুষ বলেই মনে করতেন না। তার ওপরে যদি স্বদেশীওয়ালা বলে কাউকে সন্দেহ করা হতো তো, ক্ষমতার অপব্যবহার করেও জ্যাকসন তাঁদের সামান্য ব্যাপারেই চরম দণ্ড দিতেন। আর গণেশ দামোদরের বাড়িতে তো একখানা বোমা তৈরির বইই পাওয়া গিয়েছে! সুতরাং তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়ে সাহেব তো বেজায় খুশি।

খুশি আরও এক কারণে, গণেশ সাভারকরের ব্যাপারে এত কড়া হওয়াতে সরকারও খুশি হয়ে তাঁকে ভাল জায়গায় বদলির অর্ডার দিয়েছে। সরকারের বদান্যতায় সাহেব যত না খুশি তাঁর মোসাহেবরা খুশি হয় তার থেকে অনেক বেশি। তারা ঠিক করে সাহেবকে বিদায় অভিনন্দন জানান হবে সভা করে। সভা হবে শহরের বিজয়ানন্দ থিয়েটারে। তারা সবাই তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওদিকে ইন্ডিয়া হাউসের রসুইকার চতুর্ভুজ আমিন ইংলন্ড থেকে গোপনে বেশ কখানা ব্রাউনিং পিস্তল এনে দিয়েছেন এদেশের বিপ্লবীদের হাতে। তারই একখানা যোগাড় করলেন গণেশ সাভারকরের শিষ্যারা। পিস্তল পাঠিয়েছেন বিনায়ক সাভারকর।

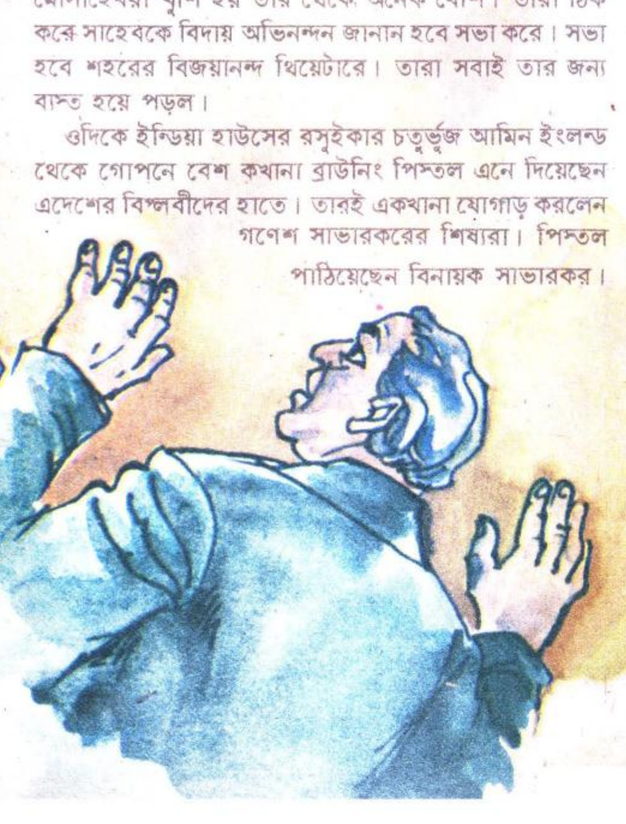

ডাক পড়ল অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে, বিনায়কনারায়ণ দেশপান্ডে আর কৃষ্ণগোপাল কার্ভের। এঁরা তিনজনই বিপ্লবী সৈনিক। দলের দায়িত্ব দেওয়া হলো বিনায়ককে।

এঁদের মধ্যে কানাড়ের সঙ্গে আবার ধিংড়ার খুবই বন্ধুত্ব ছিল। ধিংড়া তো বিলাতে ততদিনে শহীদ হয়েছেন। এবারে ডাক এসেছে কানাড়ের। কিন্তু কানাড়ে যে পিস্তল ছুঁড়তে জানেন না! কি হবে তাহলে!

দেশপান্ডে ছিলেন পঞ্চবটি স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি কানাড়েকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে হাজির হলেন স্কুল বাড়িতে। সঙ্গে গেলেন কার্ভেও। সেখানেই রাতের অন্ধকারে রিভলভার ছুঁড়ে হাত ঠিক করে নিলেন কানাড়ে।

বিদায় সম্বর্ধনার দিনটা ছিল একুশে ডিসেম্বর উনিশশ' নয় সাল। বিপ্লবীরা থিয়েটারের মধ্যে কিভাবে কাজ করবেন তা ঠিক করে নিলেন। দেশপান্ডের বাড়িতেই দেশপান্ডে তাঁর সহ-

রিভলভার ছুঁড়ে হাত ঠিক করে নিলেন কানাড়ে।

সৈনিকদের অস্ত্র দিলেন। কানাড়ে পেলেন একটা ব্রাউনিং পিস্তল, একটা ছোট রিভলভার, আর একখানা ছোরা। তিনিই প্রথম আক্রমণ চালাবেন জ্যাকসনের ওপরে। কানাড়ে সঙ্গে নিলেন এক প্যাকেট পটাসিয়াম সায়নাইড। কার্য উদ্ধারের পর যদি ধরা পড়ে যান তো, সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

থিয়েটারে ঢোকার জন্য প্রবেশপত্র আগেই যোগাড় করে রাখা হয়েছিল। দলের অনেকের সঙ্গে তিনজনেই থিয়েটারে ঢুকলেন। আগের ব্যবস্থা মতোই কানাড়ে এমন এক জায়গায় বসলেন, যেখান থেকে জ্যাকসনকে ঢোকার মুখেই সামনে পাওয়া যায়।

ঠিক হলো জ্যাকসন ঢোকার পরে সুযোগ বুঝে কানাড়ে গুলি চালাবেন। যদি তাতে কাজ না হয় তখন কার্ভে গুলি করবেন। তাতেও কাজ না হলে শেষবারের মতো দেশপান্ডে গুলি করে জ্যাকসনকে খতম করবেন।

ব্যবস্থা এমন করা হলো যাতে জ্যাকসন কোনোভাবেই না পালাতে পারে।

ঠিক সময়েই জ্যাকসন এলেন। থিয়েটারে ঢুকে এগিয়ে গেলেন তাঁর বসার জায়গার দিকে। যখন প্রায় বসার জায়গায় পৌঁছে গেছেন, কানাড়ে সামনে থেকে গুলি ছুঁড়লেন। প্রথমটা ফসকে গেল। তারপরের কয়েকটা জ্যাকসনকে ঝাঁঝরা করে দিল। তিনি সেখানেই পড়ে গেলেন।

কানাড়েকে থিয়েটারের মধ্যেই ধরা হলো। তাঁর সঙ্গে সায়নাইড থাকলেও তিনি তা ব্যবহার করার সুযোগ পাননি। বেশ কিছুদিন পরে একে একে ধরা পড়লেন দেশপান্ডে আর কার্ভে। ধরা হলো আরও বেশ কজনকে। তাঁরা সবাই ছিলেন অভিনব ভারত সঙ্ঘের সদস্য। বিনায়ক সাভারকরকেও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়ানো হলো।

সরকার পক্ষ থেকে দুটো আলাদা মামলা করা হলো। প্রথমটাতে তিন বিপ্লবীকে এক সঙ্গে হাজির করা হলো আদালতে। অন্যটাতে বাকি সকলকে। বিচারে তিনজনের ফাঁসির হুকুম হলো। অন্যদের নানা সাজা হলো।

অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে অভিনব ভারত সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন। তাঁর দেশ ঔরঙ্গাবাদ। নাসিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে। জ্যাকসনকে হত্যা করার জন্য তাঁকে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। অসীম ছিল তাঁর সাহস আর সহ্যশক্তি। একবার ধিংড়ার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়, কার কতটা সহ্যশক্তি তা নিয়ে। কেউ কারও কাছে হারমানার পাত্র নন। দুজনেই জ্বলন্ত একটা লণ্ঠনের গরম কাচে বেশ কিছুক্ষণ হাত ঠেকিয়ে রইলেন। মুখে দুজনের এতটুকুও যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না।

গোপালকৃষ্ণ কার্ভে ছিলেন ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির কর্তব্যসচেতন মানুষ। দলের মধ্যে তিনিই শুধু জানতেন কিভাবে বোমা তৈরি করতে হয়। দলের হয়ে অস্ত্রসংগ্রহের দায়িত্বও ছিল ওঁর। নানান সংস্থা থেকেই তিনি অস্ত্রসংগ্রহ করেছিলেন। বিলাত থেকে পাঠানো অস্ত্রও তিনিই সংগ্রহ করেন।

বিনায়কনারায়ণ দেশপান্ডেই ঠিক করেন বদলা নেবার কথা। তিনিই তাঁর অন্য বিপ্লবী সঙ্গীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁর কথাতেই জ্যাকসনকে সরিয়ে দেবার ব্যাপারটা বিপ্লবীরা মেনে নেন।

আদালতে যখন এঁদের তিনজনকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়, এঁদের কারও মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। কানাড়েকে যেন বেশ খুশিই মনে হচ্ছিল। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তিনজনই আদালত ছেড়ে সহজভাবেই বার হয়ে যান।

বিচারের জন্য ওঁদের এনে রাখা হয়েছিল বাইকুল্লার এক শোধনাগারে। উনিশশ' দশ সালের উনত্রিশে মার্চ ওঁদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এরপর ওঁদের বাইকুল্লার শোধনাগার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে থানের জেলে। সেখানেই উনিশে এপ্রিল উনিশশ' দশ সালে জনসাধারণের আগোচরে এই তিন বীর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়।

ইংরাজ সরকারের প্রচন্ড ভয় ছিল, ফাঁসির কথা প্রচার হয়ে পড়লে দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তা না হলেও, বিপ্লবীরা আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। আরও কঠিনভাবে ইংরাজ সরকারকে আঘাত হানার জন্য তৈরি হয়েছিলেন।

ছবি: সুফি

গোল দিল চিংড়িদা

দীপক মুখোপাধ্যায়

আমরা আদর্শ সংঘের মাঝ মাঠে বসে ঘাস চিবোচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে রাংগাজবা কেমিকেলের পেটা ঘড়িতে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে। সাধারণতঃ এতক্ষণ আমরা বাড়ি ফিরে যাই কিন্তু হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের সাজানো নৌকো ডুবতে চলেছে তাই কান্ডারী চিংড়িদাকে মাঝে রেখে আমরা ঘাস চিবোচ্ছি।

যদিও এই দুর্বিপাকের কোনো পূর্বাভাস ছিল না। আগামী কাল বিকেলে ভরাট মাঠে চন্ডিতলা ওপেন টু অল নক আউট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। প্রতিপক্ষ অমূল্যদা ইলেভেন। চিংড়িদার স্বপ্নের দল ফাইভ বুলেটস প্রায় শেষ দড়িটা ছুঁতে চলেছিল কিন্তু হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। চিংড়িদার নেতৃত্বে আমাদের তিন মাসের সাধনা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে, কেননা দলে গোলকীপার নেই। কান্ডারী চিংড়িদার মুখে কোনো কথা নেই–শুধু ঘাস চিবোচ্ছে আর ভাবছে। রাত বাড়ছে, বাবা বোধহয় অফিস্ থেকে ফিরে এসেছে–আমার বাড়ি না ফিরলেই নয়, তবু চিংড়িদার ভাবনার শেষ হলো না। আমাদেরও ওঠার উপায় নেই।

চিংড়িদার বয়স প্রায় কুড়ি। লম্বা রোগা ফর্সা একটা সাধারণ বাঙালী যুবক। ইতিমধ্যে স্কুলের গন্ডি ছাড়িয়ে আশুতোষের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বাবা-মা আফ্রিকার উগান্ডায় থাকায় চিংড়িদা চন্ডিতলায় পিসির বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। তার বাবা এবং পিসির দয়ায় আমাদের অর্থাভাব কম। বিশেষ করে 'ফাইভ বুলেটস'-এর অর্থদপ্তর বেশ সচ্ছল। চন্ডিতলায় চিংড়িদা সবার আপন। এই সতেজ নম্র দুষ্টু ছেলেটার জন্য এলাকার মানুষজনের দ্বার সদাই খোলা থাকে। 'যুধাজিৎ বিশ্বাস' বলে একটা গালভরা নাম থাকলেও 'চিংড়ি' নামটাই জনপ্রিয়। খোকন, বুচা, পরিতোষ ও আমি চিংড়িদার ফাইভ বুলেটস-এর চার বুলেট। চারজনই স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের পড়ুয়া। ফাইভ বুলেটস চিংড়িদার বুকের পাঁজর, সেই পাঁজর ফাইনালে উঠেও শুধু গোলকীপারের অভাবে তীরে এসে তরী প্রায় ডুবতে চলেছে।

অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। দলের গোলরক্ষক ভ্যাবলার অকস্মাৎ উরু ভঙ্গেই এই বিপদ। ভ্যাবলার কিন্তু খেলতে গিয়ে পা ভাঙেনি, সেমি ফাইনালে বোগাস ব্রাদার্সকে বার গোলে হারিয়েই ভ্যাবলার মাথায় শনি চাপল। কিছুদিন ধরেই ঘোষেদের গাছের নারকেলগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে

ডাকছিল। সেদিন মাঝরাতে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল গাছে। দড়ি দিয়ে কয়েক কাঁদি নারকেল নিঃশব্দে মাটিতে নামানোর পর সদ্য ঘুমভাঙা গজা ঘোষের বিকট চেঁচামেচিতে গাছের উপর থেকে লাফ মারা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। ফল উরু ভংগ। তবু ভ্যাবলা নারকেল ছাড়েনি। কাঁধে নারকেলের বোঝা চাপিয়ে কিভাবে যে সে দৌড়েছিল তা বিতর্কের বিষয়। ভ্যাবলার সংগে সংগে ফাইভ বুলেটস্-এরও পা ভাঙলো। দুদিনের মধ্যেই ফাইনাল খেলার গোলকীপার জুটবে কোত্থেকে?

সমস্যা মেটাল চিংড়িদা। সৈকত চন্ডিতলার ছেলে হলেও আমাদের সংগে কোনো সম্পর্ক নেই। সাহেব স্কুলের ছাত্র, ফটাফট ইংরেজি ছাড়া কথা বলে না। বাবার গাড়ি চড়েই তার যাতায়াত। তবে শোনা যায় 'গোলকীপার' হিসেবে সৈকত খেলছে ভাল। স্কুল দলে নাম করেছে, কিছুদিনের মধ্যেই বড় দলে নাম উঠবে কারণ তার মামা সে দলের এক ডাকসাইটে কর্মকর্তা। সেই সৈকত ফাইভ বুলেটস্-এর দুর্গ সামলাবে। যদিও এটা সম্ভব হয়েছে চিংড়িদার যাদু টোনায়। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিকেলেই জানতে পারলাম সৈকত খেলছে না–সে খেলবে অমূল্যদা ইলেভেনে।

প্রসংগটা পরিষ্কার করতে এই টুর্নামেন্ট নিয়ে একটু লেখা দরকার। 'চন্ডিতলা ওপেন টু অল'–এই প্রতিযোগিতা চন্ডিতলার ছেলে বুড়ো নিয়েই। পাড়াটাকে আট ভাগে ভাগ করে দিয়েছে টুর্নামেন্ট কমিটি। নির্দিষ্ট ভাগ থেকে খেলোয়াড় দিয়েই দল গড়েছে সবাই। যদিও গত বছরেও সামাদ পাম্পানা থেকে সুভাষ ভৌমিককেও এ মাঠে আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু নানান সমস্যায় টুর্নামেন্ট কমিটির নতুন আইনে বাইরের খেলোয়াড় আনা একদম বন্ধ। তাই নিজেদের থেকেই বাছতে হচ্ছে এগার জন যোদ্ধা। তাতে যেমন নীরাদার মতো পঁয়তাল্লিশ বছরের যুবক আছে, তেমন আছে ছোটকনের মতো তের বছরের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। নতুন আইনের জালেই আটকা পড়ল সৈকত। চিংড়িদা জানতো তাদের বাড়িটা আমাদের ভাগে কিন্তু সেটা ছিল অমূল্যদার অংশে। ফলে অমূল্যদাদের আপত্তিতে তাকে খেলতে হচ্ছে ফাইভ বুলেটস ছেড়ে 'অমূল্যদা ইলেভেনে'।

এ হেন বিপদে আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। ওদিকে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে। বাড়ি না ফিরলে সমূহ বিপদ। তবু আমরা মাঠে বসে, আশা, দলনেতা নিশ্চয় একটা উপায় বাতলাবেই। হঠাৎ চিংড়িদা মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাড়ি চল্।'

পরিতোষ শুধলো, 'লেকিন গোলকীকো ক্যায়া হোগা?'

চলতে চলতে চিংড়িদার উত্তর, 'আমি খেলব।'

ছোট্ট কথাটাতে আমরা চমকে উঠলাম।

বুড়ো বলল, 'তুমি?'

দার্শনিক কণ্ঠে চিংড়িদার উত্তর, 'হ্যাঁ আমি। বেশি চিন্তা না করে খেলার কথা ভাব, আখেরে কাজ দেবে। কটা বেজেছে খেয়াল রাখিস–এরপরে বাড়ি গেলে অর্ধচন্দ্র অবধারিত। জলদি বাড়ি যা।'

কাঁধে নারকেলের বোঝা চাপিয়ে সে দৌড়েছিল

পড়া তো দূরের কথা ঘুম অবধি মাথায় উঠেছে। চিন্তা একটাই কালকে ফাইনাল গোলকীপার চিংড়িদা! ভাবতে গিয়েও আমার কান্না পাচ্ছিল। অথচ এ দিনটার জন্য আমাদের সাধনার শেষ ছিল না। ফাইভ বুলেটস-এর নিজস্ব মাঠ নেই তাই ভোর চারটেয় উঠে আমরা টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মাঠে প্র্যাকটিস্ করতে যাই। কোচ্ পি এ্যান্ড টিতে চাকরি করা ফুটবল প্রেমী মাতুদা। মাঝ বয়সী কোচ কালো প্যান্ট সাদা গেঞ্জি আর খয়েরি কেড্‌সে সজ্জিত হয়ে রাত তিনটে থেকেই রাংগাজবার মোড়ে হুইশেলে 'ফল ইনে'র বাঁশি বাজান। আমরাও গুটি গুটি বিছানা ছেড়ে পথে নামি। মাতুদার নেতৃত্বে 'ফাইভ বুলেটস' বাহিনী মার্চ করে এগিয়ে যায় মাঠের দিকে।

মাঠে প্র্যাকটিস্। সাইড লাইনের বাইরে বসে চিংড়িদা খাতা খুলে অনুশীলনের আদি-অন্ত লিখে রাখে। পরে সেই খাতা ধরেই আমাদের শাসন হয়। নাদুস নুদুস মাতুদার অনুশীলন ছিল ভীষণ কঠিন। তিরিশ পাক দৌড়, গোটা পঞ্চাশেক ডন-বৈঠক, এলোপাথাড়ি বল পেটানোর পর দল করে ম্যাচ খেলতে আমাদের দম বেরিয়ে যেত। তবু মাতুদাকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। প্র্যাকটিস্ শেষে কোচের খরচায় আদা ছোলা বাঁধা। মাসের প্রথমে সত্যনারায়ণের কচুরী জিলিপিরও বন্দোবস্ত থাকত। এহেন কঠোর তপস্যা বিফলে যেতে বসেছে কারণ গোলী খেলবে চিংড়িদা।

সৈকতকে সামনে রেখে সমর্থকদের উল্লাসকে সংগে নিয়ে

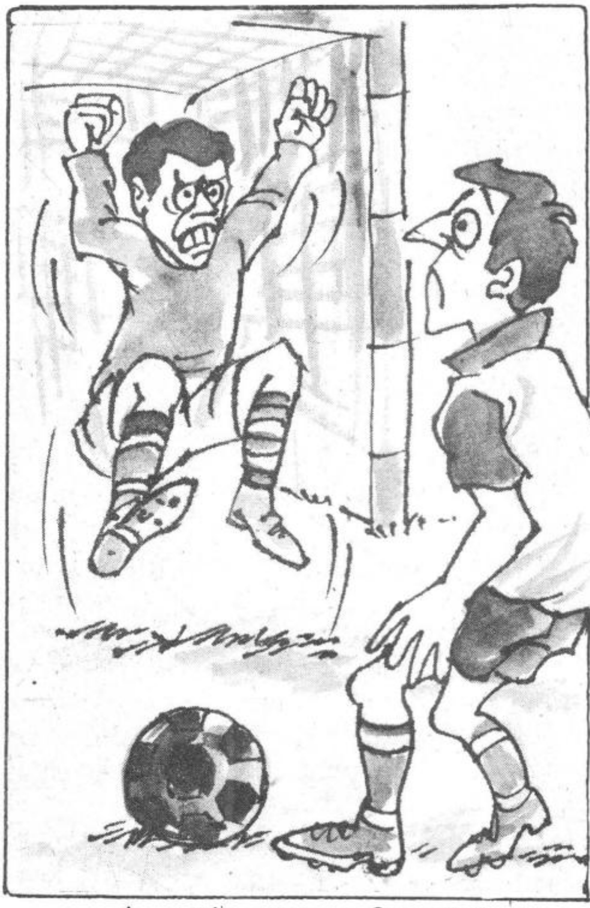

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গী করে চিংড়িদা

অমূল্যদা ইলেভেন মাঠে নেমেছে। বারের তলায় সৈকতের উল্টো-সিধে ডিগবাজি দেখতে দেখতে দুরু দুরু বক্ষে আমরাও মাঠে নামলাম। সারাদিন উপোস থাকা মাতুদা মা-কালীর খাঁড়া ধোওয়া জল মাথায় ছুঁইয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস সেই অমৃতবারির পরশে আমাদের জয় অনিবার্য। তবু আমরা মনের অস্থিরতা দমন করতে পারছি না। বার পোস্টের তলায় চিংড়িদা কিন্তু নির্বিকার। তার সাজটিও পরিপাটি। চোখেমুখে ধ্বংগরাজের প্রত্যয়।

টস্ হয়ে গেল। অমূল্যদাদের সেন্টার। রেফারী হাবু দত্ত খেলা শুরুর বাঁশি বাজালেন। প্রথম থেকেই প্রতিপক্ষের চাপের ফাঁসটা ক্রমশই আমাদের গলায় চেপে বসছিল। কিন্তু আমাদের দুই ব্যাক অন্ট আর ছোটকনের অসাধারণ বিক্রমে বার বার আক্রমণগুলো ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। কোনোভাবেই চিংড়িদার কাছে বল যেতে তারা দিচ্ছিল না।

পরে কিন্তু অবাক করল চিংড়িদা! গুটি ছয়েক অবধারিত গোল বাঁচল তারই কৃতিত্বে। যদিও খেলার ধরন ছিল অন্যরকম। প্রথম সুযোগটার কথাই ধরা যাক। একটা নির্বিষ বল অন্টর পা ফস্কে চলে গেল অমূল্যদার পায়ে। অমূল্যদা সর্পিল গতিতে প্রবেশ করলো আমাদের পেনলটি বক্সের মাঝামাঝি। সামনে শুধু অসহায় চিংড়িদা। অবধারিত গোল। কিন্তু হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গী করে চিংড়িদা মারল এক লাফ। তার বিচিত্র আচরণে তাড়াহুড়ো করে অমূল্যদা পা চালাল। অবধারিত গোলও উড়ে গেল বার উঁচিয়ে মাঠের বাইরে। এইভাবে ফুটবল ব্যাকরণের বাইরে নানান আজব আচরণে চিংড়িদা ছ'বার দলের পতন রুখে দিল। আমরা কিন্তু পঁয়ত্রিশ মিনিটে একবারই বিপক্ষ সীমানায় হানা দিয়েছিলাম, যদিও আমারই তৎপরতায় সে সুযোগ বিফলে গেছে অফসাইডের মাধ্যমে।

হাফটাইমের লম্বা বাঁশি কিছুক্ষণের জন্য আমাদের রক্ষা করল। যদিও সমর্থকদের ধিক্কার আমাদের রেহাই দিল না। সেই সঙ্গে চিংড়িদার কীর্তি মুখে মুখে ফিরতে লাগল। চিংড়িদা কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে শুধু ভাবছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর প্রাক মুহূর্তে মাতুদা সবাইকে নুন আদা দিয়ে বললেন, 'চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেল। যেভাবেই হোক জেতা চাই নইলে পাড়ায় ঢুকতে দেব না।'

মাতুদার নুন আদার গুণেই বোধহয় ফাইভ বুলেটস দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে উঠলো। যেখানে বল সেখানেই আমরা। বিশেষ করে বুড়া, পরিতোষ, খোকন, ছোটকোনকে সামাল দিতে অমূল্যদা ইলেভেন হাঁসফাঁস করছিল। আক্রমণের ধার বাড়লেও সৈকতের অপূর্ব গোলরক্ষায় কোনোভাবেই লক্ষ্যভেদ করা যাচ্ছিল না। অবশেষে পেনাল্টি। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নীরাদা শরীরটাকে একপাক ঘুরিয়ে বল বাড়াল ফাঁকায় দাঁড়ান বুড়ার দিকে। সামনের ফাঁকা জমি দিয়ে বুড়া তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কোনো উপায় না দেখে হুমায়ুনদা সরাসরি পা চালালো বুড়ার থাইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাবু দত্তের বাঁশিতে পেনাল্টির নির্দেশ। কিন্তু পেনাল্টি স্পেশালিস্ট অন্টর মারা বলটা যখন দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে ঢুকতে চলেছে ঠিক তখনই সৈকত পিঠে ডানা বেঁধে উড়ে গিয়ে বলটা তার অব্যর্থ হাতে জমা করে নিল।

বুঝলাম জয়লক্ষ্মী আজ আমাদের প্রতি বিমুখ। আবার আমরা চাপের মুখে। হাফলাইন থেকে বল ধরে হুমায়ুনদা তরতর করে উপরে উঠে এসে স্কোয়ার পাসে বল বাড়াল মানিক ঘোষকে। মানিক ঘোষের আউট সাইড ডজে গোল মুখটা ফাঁকা–আবার গোলের সুযোগ। কিন্তু হঠাৎ চিংড়িদা পেট চেপে আর্তচিৎকার করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। মানিকদা বল ছেড়ে দৌড়োলো চিংড়িদার কাছে। তখনও চিংড়িদা "বাবাগো, মরে গেলাম" বলে–কাটাছাগলের মতো ছটফট করছে। সবার সুশ্রূষায় চিংড়িদা সুস্থ হবার পর খেলা শুরু হলো। কিন্তু তখন আমাদের মাথার উপর কালো মেঘটা কেটে গেছে।

খেলা শেষ হতে আর মিনিট পাঁচেক বাকি। হঠাৎ চিংড়িদা আমাদের হতবাক করে মাঠ ছেড়ে বাইরে চলে গেল। বাধ্য

হয়ে স্টপার অষ্ট নিজের জায়গা ছেড়ে বার পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিংড়িদা হাঁফাতে হাঁফাতে মাঠে ফিরে এল। হাতে সময় মাত্র আর দু মিনিট। আমরা গোলের জন্য মরিয়া হয়ে শেষ কামড় বসালাম। রাইট হাফ গোপাল বল দিল অষ্টকে। অষ্ট বাঁদিক থেকে বলটা তুলে দিল ডাইনে এগিয়ে থাকা বুড়োর পায়ে। প্রায় ভেল্কি দেখিয়ে বুড়ো তিনজনকে টলিয়ে দিয়ে পেনাল্টি বক্সের মাথায় খোকোনের মাথায় সাজাল নিপুণ ভঙ্গিতে। খোকোনও তৎপরতার সঙ্গে বলটা আমার পায়ে নামিয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করে সৈকতের বাঁ পাশ দিয়ে বলটা ঠেলতে গিয়েই দেখি চিংড়িদা নক্ষত্র-গতিতে আমার পাশ দিয়ে উঠে গিয়ে সৈকতের কাছে পৌঁছেই আবার ফেরার জন্য দৌড় লাগাল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি শট করতেও ভুলে গেলাম। বলটা নিজে থেকেই আমার হাঁটু ছুঁয়ে গড়াতে গড়াতে সৈকতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। লজ্জায় ঘৃণায় আমি চোখ বন্ধ করে মাটিতে বসে পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ চারদিক থেকে গগনবিদারী 'গোল, গোল,' চিৎকারে আমি চোখ খুলে দেখি বলটা গড়াতে গড়াতে অমূল্যদা ইলেভেনের তেকাঠির মধ্যে প্রবেশ করে জাল ছুঁতে চলেছে। গোলকীপার সৈকত বারের তলায় নেই। মুখ তুলে দেখি সৈকত রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে বাড়ির দিকে।

কিছু ভেবে উঠবার আগেই মাতুদা কাঁধে তুলে নাচাতে শুরু করেছে। ভরাট মাঠ তখন আমাদের সমর্থকদের দখলে। কিছুক্ষণ আগেও যারা 'দুয়ো' বলে ধিক্কার দিচ্ছিল তারাই এখন উন্মাদের মতো নাচছে। মুখে শ্লোগান, 'জিতেছে জিতেছে, ফাইভ বুলেটস জিতেছে।' কোনোরকমে মাঠ পরিষ্কার করে খেলা শুরু করেই হাবু দত্ত বাঁশি বাজিয়ে খেলা শেষ করলেন।

সমর্থকদের মাথায় চেপে আমরা পাড়ায় ফিরলাম। আমাদের স্বপ্ন আজ সার্থক–ফাইভ বুলেটস চ্যাম্পিয়ান।

অনেক সাধ্য সাধনার পর চিংড়িদা রহস্য উদ্ঘাটিত করেছিল। সৈকতদের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এক বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে। ভ্যাবলার পা ভাঙার পর চিন্তায় চিংড়িদা সে রাতে ঘুমুতে পারছিল না। রাত তখন প্রায় এগারোটা। চিংড়িদা সৈকতদের বাড়ির রোয়াকে বসে বিপদ থেকে বাঁচার পথের সন্ধান করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ দোতলা থেকে শোনা গেল–'বাঁচাও, বাঁচাও' আর্তচিৎকার।

নির্ঘাৎ ডাকাত কিংবা আগুন, পরোপকারী চিংড়িদা ছুটে গিয়েছিলে সৈকতদের দোতলার ফ্ল্যাটে। পৌঁছে দেখে সৈকতের বাবা মিঃ রায় কোলাপ্সিবল গেটটা ধরে ঠকঠক করে কাঁপছেন। চিংড়িদার প্রশ্নে কোনো উত্তর না করেই তিনি শুধু আঙুল তুলে সৈকতের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। চিংড়িদার মাথায় তখন একটাই চিন্তা ছেলেটা আত্মহত্যা করেনি তো?

ঘরে ঢুকেই চিংড়িদা দেখলো–সৈকত পড়ার টেবিলের উপর সোজা দাঁড়িয়ে, মুখটা কাগজের মতো সাদা। রক্ষাকর্তাকে দেখতে পেয়েই বোবার মতো শব্দ করে মেঝেটাকে দেখাল। একটু খুঁজেই চিংড়িদা মোজাইক করা মেঝেতে বস্তুটাকে আবিষ্কার করল। সমস্ত রহস্য চিংড়িদার কাছে মুহূর্তে পরিষ্কার। মুচকি হেসে চিংড়িদা সাহসী পদক্ষেপে ভয়ংকর বস্তুটাকে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। পিতা-পুত্রও আবার প্রাণ ফিরে পেল।

সৈকতের মা কাজের লোক নিয়ে বর্ধমান গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষার্তে। সে রাতেই এই ভয়ংকর বস্তু সৈকতের পড়ার ঘরে হাজির। পিতা-পুত্র দুজনেরই এই বস্তুর প্রতি বিরাগ। চিংড়িদাই তাঁদের রক্ষাকর্তা। মিঃ রায় প্রায় হাতে ধরে বার বার চিংড়িদার ঋণ জীবনে অপরিশোধযোগ্য বলতে, বিষয়ী চিংড়িদা ফাইভ বুলেটস-এর বিপদটা জানিয়ে সৈকতকে গোলকীপার হিসেবে চেয়ে বসেছিল। পাড়ায় খেলতে দিতে অনিচ্ছুক হলেও এই উপকারী বন্ধুর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন মিঃ রায়। কিন্তু বিধি বাম, তাই অমূল্যদাদের প্রতিবাদে সৈকত শুধু দল ছাড়তেই বাধ্য হয়নি আমাদের বিপক্ষদলের কাঠির তলায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল।

সৈকতকে সামনে রেখে তুড়ি মেরে ম্যাচ বার করবার মতলবেই সেদিন অমূল্যদা মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু চিংড়িদার ভানুমতির খেলে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। গোল না খেলেও সৈকতকে পরাজিত করা অসম্ভব দেখেই চিংড়িদা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হলো।

খেলা শেষ হবার মিনিট পাঁচেক আগে চিংড়িদা মাঠ ছাড়ল, যখন ফিরল তখন তার হাতের মধ্যে ধরা একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক। তারপর সেই মুহূর্ত। আমাদের উপরে উঠতে দেখেই চিংড়িদা দৌড়োতে শুরু করল, লক্ষ্য সৈকত। বিদ্যুৎবেগে সৈকতের সামনে পৌঁছেই কাগজের মোড়ক ফেলল সৈকতের পায়ের কাছে। ফেরার মুখে প্রায় কানে কানে বলে এলো 'সৈকত ককরোচ্।'

হ্যাঁ, সে রাতে এক আরশুলা পুঙ্গব দেখেই পিতা-পুত্র প্রায় চেতনা হারাতে বসেছিল। তাই 'ককরোচ' শোনা আর পায়ের কাছে কাগজের মোড়ক দেখামাত্রই অমূল্যদা ইলেভেনের 'একাকুম্ভ' সৈকত মাঠ ছেড়ে পালিয়েছিল বাড়ির দিকে আর আমার হাঁটুতে লাগা বলটা নিশ্চিন্তে ঢুকেছিল তার গোলের মধ্যে। যদিও মোড়কটা ছিল ফাঁকা তবু চিংড়িদার মুখে 'ককরোচ' শোনার পর সৈকত বিপন্ন হতে রাজী হয়নি।

সে বছর চন্ডিতলা ওপেন টু অল চ্যালেঞ্জ শীল্ড তুলেছিল ফাইভ বুলেটস। তবে গোলটা আমি করিনি, করেছিল চিংড়িদা দি গ্রেট, থ্রিচিয়ার্স ফর চিংড়িদা।

ছবি: সুফি

আলপসের তুষার রাজ্যে ম্যাম'জেল এক্স (কার্তিক সংখ্যার পর)

প্লেনটা খুঁজে বের করতে ম্যাম'জেল এক্সের খুব একটা বেশি সময় লাগলো না।
আরে.... পাইলট কোথায় গেলো!
সে প্লেনের চারপাশে ঘুরতে লাগলো।
নির্ঘাৎ জঙ্গলের দিকে গেছে। ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।
কিছুক্ষণ পরে.......
ঐ তো, বেঁচে আছে......... খুব চোট পেয়েছে বোধ হয়।
পাইলট ঘোরের মধ্যে ছিলো......
ভয় পেও না। আমি ম্যাম'জেল এক্স। তোমার কাছে যে কাগজপত্তর আছে সেগুলো নিতে আমায় পাঠানো হয়েছে।
ম্যাম'জেল এক্স?
কাগজপত্তর? ধরা পড়ার ভয়ে আমি......আমি সেগুলো লুকিয়ে.......
একী! কেউ এদিকে আসছে নাকি? সর্বনাশ.......
(চলবে)

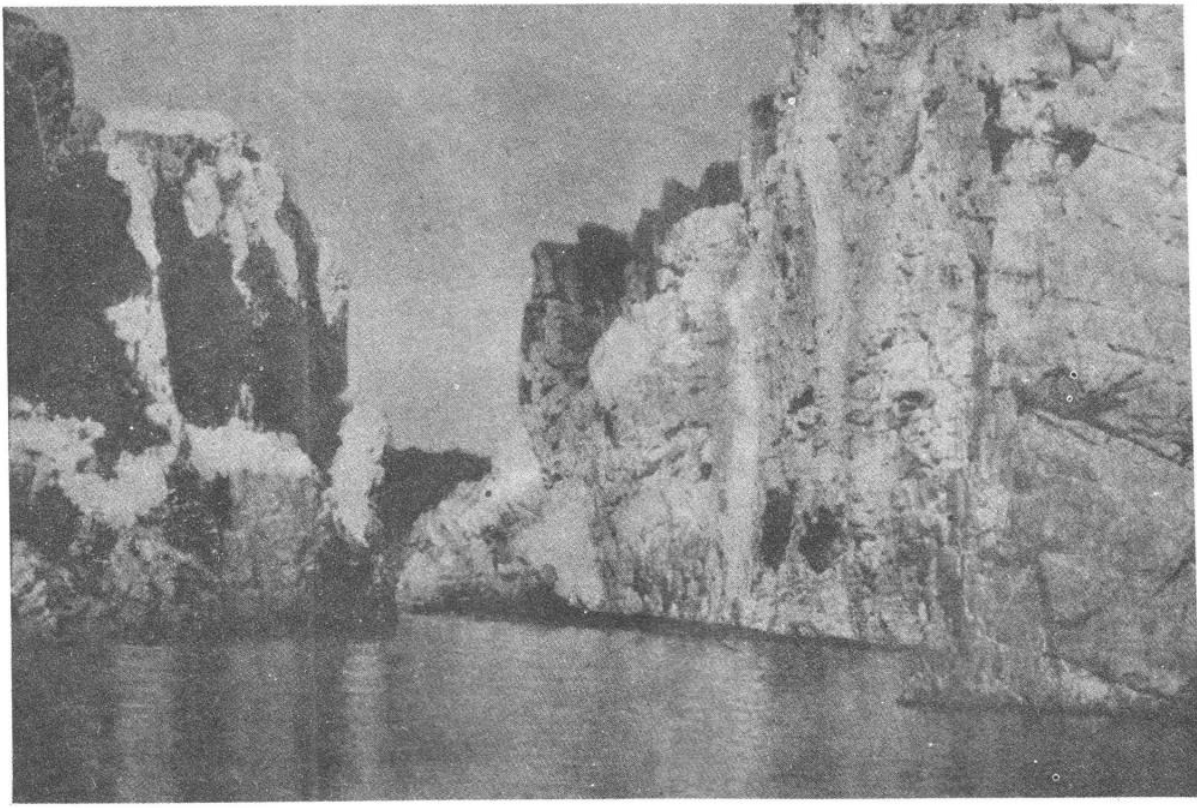

অজানা পৃথিবী

অপরাজিতা

জব্বলপুরের শ্বেতপাথরের পাহাড়

শহর জব্বলপুরের উনত্রিশ কিলোমিটার দূরে ভেরাঘাট। নর্মদা নদী এই ভেরাঘাটের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এই পাহাড়ী ঘাট পথের প্রায় পুরোটাই শ্বেতপাথর।

নদীর জলের উপর থেকে দু'পাশের পাহাড়ী দেওয়াল খুবই উঁচু। অতীতে কোনো সময়ে নদী বোধহয় এই পাহাড়ের মাথার উপর দিয়েই বয়ে যেত। যুগ যুগান্তরের স্রোতের ধারায় পাহাড় কেটে নদী এখন এই গভীর পাহাড়ী খাদের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে। দু'পাশের পাহাড়ী দেওয়াল দেখলে তাই মনে হয়। জলের স্রোত আর আবহাওয়া মিলে দু'পাশের শ্বেতপাথরের দেওয়ালের গায়ে অদ্ভুত সব নক্সা তৈরি করেছে। কোনোটাকে হাতির মাথা বলে মনে হয়। কোথাও বা মানুষের মুখ, অন্য আর এক জায়গায় যেন একটা প্রকান্ড পাখি বসে আছে। এসবই শ্বেতপাথরের দেওয়ালে জলের স্রোত আর আবহাওয়ার কারিগরী।

নর্মদা দু'পাশের ধপধপে সাদা পাথরের দেওয়ালের, মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। কোথাও কোথাও নদী বেশ চওড়া। কোথাও নদীর জলের তল থেকে এখানে ওখানে ডুবো শ্বেত পাথরের ছোট্ট ছোট্ট চূড়া মাথা তুলে আছে। এক জায়গায় একটা ছোট্ট দ্বীপ, জল-হাওয়ার গুণে সেখানে এমনই ক্ষয় ধরেছে যে মনে হয় দ্বীপের উপরে কেউ যেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ ছাড়া শ্বেতপাথরের দেওয়ালের মাঝে এক এক জায়গায় কিছুটা কালো পাথরও দেখা যায়। আর এক জায়গায় সামান্য হলদে পাথর।

দিনের আলোয় আর চাঁদনি রাতে এই শ্বেতপাথরের ঘাট পাহাড় নদীর বুক থেকে অপূর্ব দেখায়। এখানে শীতকালে তাই প্রচুর ভ্রমণকারী আসেন।

নদীর গভীরতা ঘাট পাহাড়ের মাঝে কোথাও কোথাও দুশ মিটারের মতো গভীর। নদীর উপরের জলে স্রোত আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু নদীর গভীরে প্রচন্ড স্রোত আছে জলে। নদীতে প্রচুর কুমীরও আছে।

এক জায়গায় নদী খুবই প্রশস্ত। সেখানেই শ্বেতপাথরের দু'পাশের দেওয়াল যেন নদীকে ঘিরে ফেলেছে। তারই মাঝের এক ফাটল দিয়ে নর্মদা নদী জলপ্রপাত হয়ে ঘাটের বাইরের অঞ্চলে নেমে যাচ্ছে।

প্রবীরকুমার ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

অব্যর্থ চিকিৎসা

সুজিতকুমার পাত্র

সুমন পড়েছে মহা সমস্যায়। কার কথা শুনবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সে। আসলে সকাল থেকেই তার ভীষণ পেট ব্যথা। মা বললেন, 'যা পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবুর কাছে থেকে ওষুধ নিয়ে আয়।' সুমন তাই যাচ্ছিলো। এমন সময় ছোট কাকা এসে হাজির।

'আরে এই বয়সে পেটের রোগ বাধিয়ে ফেলেছিস ? নির্ঘাৎ লিভারটা গেছে। তুই জলদি মোহন কবিরাজের কাছে যা। এসব রোগ কবিরাজী ওষুধ ছাড়া কোনোদিন ভালো হবার নয়।' বলে ছোট কাকা চলে গেল।

তারপরেই বড়দা এসে হাজির।

'সুমি, শুনলাম তোর নাকি পেটে ব্যথা। শোন, ভালো চাস তো এখনি পাল ডাক্তারের কাছে যা। ওসব হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ভুয়ো জিনিস, ওতে আবার রোগ ভালো হয় নাকি!'

রিকশা থেকে নেমে সুমন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে কী মনে করে মোহন কবিরাজের ঔষধালয়ের দিকে পা বাড়ায়।

দশ মিনিটের পথ। ঢুকতে গিয়েই চমকে ওঠে সুমন। এ কী! ডাক্তার! না যমরাজ স্বয়ং! বিশাল বপু, টাক মাথা, এক ভদ্রলোক চেয়ারে পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। ডাক্তারকে দেখেই সুমনের পেট গুরগুর করে ওঠে, ব্যথাটা আরও বেশি বেড়ে যায়। ভাবে, দরকার নেই বাবা, তার চেয়ে বরং বড়দার পাল ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাক। সেখান থেকে পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সুমন।

পাল ডাক্তারের চেম্বার সেখান থেকে মিনিট দুয়েকের পথ। চেম্বারের বাইরে জনাকয়েক রোগী অপেক্ষা করছে। ভিতরে ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন। মাঝে একটা পর্দা ঝোলান। সুমন পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারে। দেখে দুজন লোক একটা লোককে চেপে ধরে আছে, আর একজন ভদ্রলোক (বোধহয় ডাক্তারবাবু) ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে রোগীর হাতে ফোটাতে উদ্যত।

কান্ড দেখে সুমনের পিলে চমকে ওঠে। ইনজেকশনকে এমনিতেই সুমনের ভয়। ও পড়িমরি করে চেম্বার ছেড়ে রাস্তায় পালিয়ে আসে। কিন্তু কে জানতো রাস্তার একপাশে নেড়ি কুত্তাটা গুটুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে! সুমন হুড়মুড় করে এসে কুকুরটার গায়ের ওপর পড়ে। পড়েই বেগতিক বুঝে এক লাফে উঠে দৌড় লাগায় রাস্তা বরাবর। পিছন ফিরে দেখে কুকুরটা তার পিছু পিছু তেড়ে আসছে। সুমন স্পীড আরও বাড়িয়ে দেয়। যতই হোক স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সে। তার সংগে কি আর রাস্তার একটা কুকুর পেরে ওঠে!

সুমন দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বাড়ির সামনে এসে থামে। পিছন ফিরে দেখে, না কুকুরটা নেই। সে হাঁফাতে হাঁফাতে চুপচাপ খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে নিজের ঘরে এসে ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দেয়, নরম বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হয় সুমন আর তখনই খেয়াল হয় 'আরে পেটের ব্যথাটা তো আর একদম নেই।'

প্রবীরকুমার ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

বোবা কান্না

গৌতমকুমার গোস্বামী

মফঃস্বলের এক ছোট হাসপাতালে বদলি হয়ে এসেছি। পাশাপাশি অনেকগুলি আদিবাসীদের গ্রাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের চিকিৎসার জন্যই তৈরি হয়েছিল এই হাসপাতাল। হাসপাতালের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী কুমারী। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফাঁকা মাঠ। আগে এইসব মাঠে শাল পলাশ মহুয়ার জংগল ছিল। কিন্তু মানুষের হাতে সেসব কবেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন ডুংরির ওপর দেখা যায় কিছু কিছু বুনো ঝোপ।

হাসপাতালের অবস্থাও খারাপ। না আছে কোনো ওষুধপত্র, না আর অন্য কোনো ডাক্তার। আদিবাসীরা এখানে অনেক আশা নিয়ে আসে, কিন্তু তাদের সেই আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি না বলে ভীষণ দুঃখ হয়। ভীষণ অসহায় বোধ করি। বুঝতে পারি, ভারতের সব গ্রামীণ হাসপাতালগুলির

অবস্থা প্রায় একই রকম।

বর্ষার রাত, প্রায় ১০।১১টা। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, এমার্জেন্সী রুমে বসে বসে একটা ডাক্তারী জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময় মনে হলো বাইরে যেন কে কাঁদছে। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। কান্নাও আর শুনতে পেলাম না। ফিরে এলাম, কিন্তু অল্প পরেই শুনতে পেলাম "খোকারে" বলে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকার!

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম, কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই! অথচ আমি তো দু'দুবার স্পষ্ট শুনেছি নারীকণ্ঠের ওই আর্ত কান্না!

কম্পাউন্ডার হরকিষণকে ডেকে তুললাম। সে স্থানীয় লোক। এখানে অনেকদিন আছে। সব শুনে মনে হলো সে যেন বেশ ভয় পেয়েছে! তবু বলল, 'ও কিছু নয় বাবু, যান আপনি শুয়ে পড়ুন গে ?

বুঝতে পারলাম, সে কিছু লুকিয়ে যাচ্ছে।

আমার অত্যন্ত জেদাজেদিতে সে বলল, 'সে অনেক কথা বাবু। আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে এমনই এক বর্ষার দিনে ঘটনাটা ঘটেছিল। পাশের মুংরী গ্রামের এক বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলেকে সাপে কামড়ায়। তার মা ঝাড়ফুঁক, আর সমস্ত কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মুশকিল হলো, হাসপাতালে সাপে কামড়ানোর ওষুধ ছিল না। ডাক্তারবাবু আর কি করবেন, সাধ্যমতো ছেলেটার চিকিৎসা করলেন। মাকে মৌখিক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু আপন মনেই বলতে লাগলেন, 'ওষুধ পেলে একে আমি বাঁচাতে পারতাম কিংবা একটা গাড়ি পেলে একে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কোনো উপায় নেই।'

মায়ের কোলের উপরই ছেলেটা মারা গেছিল বাবুজী। মাও,'খোকারে' বলে চিৎকার করে সেই যে অজ্ঞান হলো আর তার জ্ঞান ফেরেনি ডাক্তারবাবু। সেই থেকে এই রকম বর্ষার রাতে সেই মায়ের আর্ত কান্না শোনা যায়।'

অবাক হয়ে সমস্ত শুনলাম। ভাবলাম, একি শুধু অশরীরী প্রেতাত্মার কান্না, নাকি এ কান্না গ্রামপ্রধান ভারতের জনগণের বোবা কান্না!

ছবি : সুফি

এদের লেখাও ভালো হয়েছেঃ সুখেন্দু দাস/ ফুলবাড়ি, ননীগোপাল পাল/ ডিব্রুগড়, মহম্মদ ইমানুদ্দিন/ মুর্শিদাবাদ, সন্দীপ হালদার/ বারাসত, সোমালী চ্যাটার্জী/ পুরুলিয়া, বিপ্লব পাল/ মুর্শিদাবাদ, অতনু বিষয়ী/ চম্পাহাটি, বিশ্বদীপ বসু/ বাঁকুড়া, মিঠুন চক্রবর্তী/ নড়িদানা, অসীমকুমার ধাড়া/ মেদিনীপুর, অনির্বাণ চক্রবর্তী/ কলকাতা, জয়তি রায়/ নিউদিল্লী, মিঠু পাল/ ডিব্রুগড়, শংকর ভট্টাচার্য/ কলকাতা, আম্রপালী দেবী/ করিমগঞ্জ, জয়দীপ সরকার/ মুগমা।

ঘোষণা

ঠাকুরবাড়ি রোড, কলকাতা ২৬ থেকে অরুণকুমার মুস্তাফি তাঁর প্রয়াতা কন্যা কৃষ্ণার স্মৃতি রক্ষার জন্যে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

কৃষ্ণা মুস্তাফি

জন্ম–১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

মৃত্যু– ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

বিষয়বস্তু

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ পৌষ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার–৫০ টাকাঃ দ্বিতীয় পুরস্কার–৩০ টাকা

আলট্রা-ভায়োলেট রহস্য

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিটা পড়া শেষ করে সৃজনকাকা বললেন, 'ডিসেম্বরের শেষে তোর কলেজ ছুটি আছে তো বাদল?'

'হ্যাঁ আছে। কেন?'

'তখন দিন কয়েকের জন্য বাঁকুড়া যাবি নাকি?'

'কী ব্যাপার, কোনো রহস্যসন্ধান নাকি!'

'না না, সেসব কিছু না। নিছক বেড়াতে। সেই যে আমার বন্ধু অমল সামন্ত এখন বাঁকুড়ার ডি এফ ও। যাওয়ার জন্য লিখেছে। আগেও দু'একবার লিখেছিল। তখন তো সময় পাইনি। কিন্তু এখন কাজকর্মের চাপ কম। ভাবছি দিন সাতেকের জন্য বেড়িয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, চলো আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিন বিকেল নাগাদ পৌঁছে গেলাম বাঁকুড়ায়। অমল সামন্তর বাড়ি খুঁজে বের করতে কোনো ঝামেলা হলো না। রিকশাওয়ালাই নিয়ে এলো।

বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর বাড়ি। সঙ্গে অনেকটা জমি। নানারকম গাছপালা সেখানে। তার মধ্যে অবশ্য ইউক্যালিপটাসই বেশি। বাড়িতেই ছিলেন অমল সামন্ত। সাইকেল রিকশার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমাদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন অমলবাবু, 'যাক শেষ পর্যন্ত এলি তাহলে?'

'আসব না মানে! এমন নিশ্চিন্তে আরাম করবার জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই সাতদিন শুধু খাওয়া-দাওয়া ঘুম আর বিকেলে একটু বেড়ানো। ব্যস! আর কিচ্ছু নয়, বুঝলি!'

'কিন্তু জানিস তো ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাই এখানে এসেও তুই বোধহয় রেহাই পাবি না। তোর জন্য এখানে কাজ তৈরি হয়েই আছে।'

ভুরু কুঁচকে বললেন সৃজনকাকা, 'তোকে তো আগেই বলে রেখেছি, এবার আমি এসব ব্যাপারে একেবারেই মাথা ঘামাতে চাই না। এই সাতদিন শুধু বিশ্রাম।'

'তা তুই সারাদিন বিশ্রাম নে না। কেউ আপত্তি করবে না। শুধু এরই ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু–'

'তোর মতলবটা কী বল তো!'

'আমার মতলব কিছু নেই। এখানকার এস পি অর্থাৎ সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ মিঃ সমাদ্দার তোর সঙ্গে একটা ব্যাপারে একটু পরামর্শ করতে চান।'

'আরে এখানে আবার পুলিশ আসছে কী করে? তুই

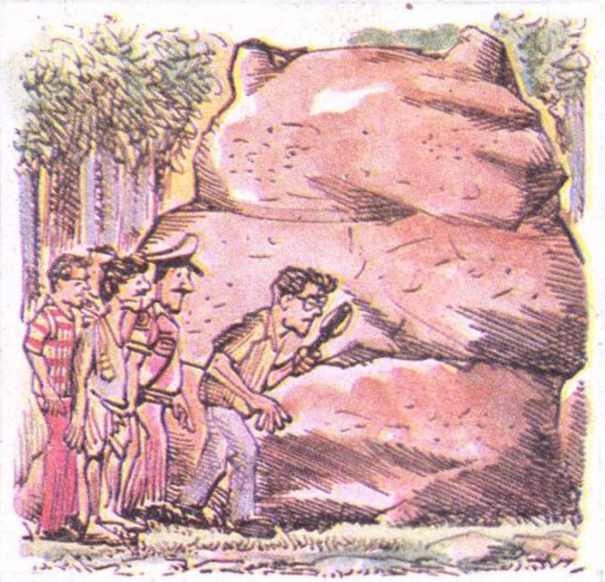

পাথরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন।

নিশ্চয়ই ওঁকে আমার কথা বলেছিস।'

'আরে না না, কিছুই বলিনি। তুই যেদিন কলকাতা থেকে ফোনে আমার সংগে কথা বলছিলি, সেদিন মিঃ সমাদ্দার সামনেই বসে ছিলেন। তারপর বুঝতেই পারছিস, টু প্লাস টু মেকস্ ফোর। উনি বোধহয় একটু পরেই এসে যাবেন খোঁজ নিতে।'

সত্যিই তাই। আধ ঘণ্টার ভেতরেই জিপের হর্ন শোনা গেল। আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অমল সামন্ত। একটু পরেই ঢুকলেন এক ভদ্রলোককে নিয়ে। বেশ লম্বা চওড়া শক্তসমর্থ চেহারা। বুঝলাম ইনিই মিঃ সমাদ্দার। বাঁকুড়ার এস পি। এখানকার পুলিশের বড়কর্তা।

পরিচয়ের পালা চুকলে সবাই মিলে বেশ গুছিয়ে বসলাম অমল সামন্তর ড্রয়িং রুমে। গরম গরম পকৌড়া আর সিংগাড়ার সংগে চা খেতে খেতে নানারকম গল্প। মিঃ সমাদ্দার বেশ মজলিশি লোক। নানারকম গল্প জানেন। সেসব শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাচ্ছিল বুঝতেই পারিনি।

কিছুক্ষণ পরে সৃজনকাকা বললেন, 'অমল বলছিল কী একটা সমস্যার কথা?'

মিঃ সমাদ্দার বললেন, 'সেটা বলতেই তো আপনার কাছে আসা। তবে ব্যাপারটা কেবল আমার সমস্যাই নয়, মিঃ সামন্তরও বটে। কারণ ঘটনাটা ওঁরই জংগলে ঘটছে।'

'তাই নাকি!'

এরপর মিঃ সমাদ্দার যা বললেন, তা মোটামুটি এই রকমঃ

বাঁকুড়া থেকে কিছুদূরে রানীবাঁধ বলে একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে খানিকটা দূরে একটা জংগল। আজকাল কিছুদিন ধরে সেই জংগলে রাতের দিকে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। সে কি বিকট আওয়াজ! শুনলে পিলে চমকে যায়। শুধু বাঘের আওয়াজ নয়, বাঘের আওয়াজের সংগে সংগে নাকি পাশের কুসুমডিহি গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে ইঁট পাটকেলও পড়ে। এই খবরটা পেয়ে পুলিশের তরফ থেকে শিকারী পাঠানো হয় ঐ জংগলে। কিন্তু শিকারীর মতে, ঐ জংগলে নাকি কোনো বাঘই নেই। অথচ কুসুমডিহি গ্রামের মানুষদের মধ্যে দু'চারজন নাকি নিজের চোখে বাঘ দেখেছে। বিরাট লম্বা বাঘ, কটকটে নীল চোখ। এখনো পর্যন্ত প্রতিদিন রাতে বাঘের ডাক ও ইঁট-পাটকেল পড়ার বিরাম নেই। গ্রামের লোকের ধারণা, এ নিশ্চয়ই কোনো বাঘ-ভূতের কারবার। সেই বাঘ-ভূতের ভয়ে গ্রাম থেকে লোকজন পালাচ্ছে দলে দলে। সরকার থেকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য জরুরি নির্দেশ এসেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এর রিপোর্ট পাঠাতে হবে সরকারের কাছে।

সবকিছু শুনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন সৃজনকাকা। তারপর বললেন, 'মিঃ সমাদ্দার, আপনার সমস্যাটা সত্যিই অন্য ধরনের। এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা আগে কখনো শুনিনি।'

অমল সামন্ত সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস সৃজন, ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। সমস্ত জায়গা ঘুরে বাঘের কোনো পায়ের ছাপ বা অন্যান্য কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না, অথচ রাত হলেই—'

'শুরু হয়ে যায় বাঘের ডাক আর ঢিল পড়ে—', অমল সামন্তর কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠি।

সৃজনকাকা বলেন, 'ব্যাপার দু'টো সত্যিই মেলানো যায় না। কোনো বাঘ নিশ্চয়ই ঢিল ছোঁড়ে না। ওটা যে মানুষের কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঘের ডাকটা নিয়েই যত ঝামেলা। বাঘ যে নেই, তাও বলতে পারছি না, কারণ গাঁয়ের লোক বাঘের ডাক শুনেছে, বাঘটাকে দেখেছে। তবে একটা ব্যাপার একটু সন্দেহজনক ঠেকছে। বাঘটার হাতে কেউ মরেনি বা ঘায়েল হয়নি। বাঘ যে এতো নিরামিষ প্রাণী তা তো জানতাম না।'

আমি বলে উঠলাম, 'এতে অবাক হবার কী আছে? বাঘটা হয়তো কারো পোষা।'

'কাকা হেসে বললেন, 'পোষা হলে তো দিনের বেলাতেও দেখা যাবে। একটা জলজ্যান্ত বাঘকে কি কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে? তাও এই গাঁয়ের মধ্যে!'

'তাহলে?'

'তাহলে এমনও হতে পারে, সত্যি সত্যি এখানে বাঘ নেই।'

অমল সামন্ত বললেন, 'তাই বা কেমন করে হবে? গাঁয়ের বেশ কিছু মানুষ বাঘটাকে নিজের চোখে দেখেছে। ইয়া বিরাট চেহারা! নীল চোখ—'

'হ্যাঁ, সেটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে শিকারীর কথাও ফেলনা নয়, ঐ জংগলে কোনো বাঘ নেই। এই ব্যাপারটা

নিয়েই যত জট।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন সৃজনকাকা।

মিঃ সমাদ্দার কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বললেন, 'শিকারী কিংবা গাঁয়ের মানুষ, কারো কথাতেই পাত্তা না দিয়ে তার চেয়ে বরং চলুন নিজের চোখেই দেখে আসবেন জায়গাটা–'

'তা মন্দ বলেননি, আমিও সে কথাই ভেবেছি।'

'কবে যাবেন বলুন?' উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করেন মিঃ সমাদ্দার।

'সবে কলকাতা থেকে এসেছি। শরীর কিছুটা ক্লান্ত। দিন দুই-তিনের বিশ্রাম দরকার। তারপর না হয় যাওয়া যাবে, কী বলিস অমল!'

'ঠিক আছে, আজ মংগলবার। মাঝে তিন দিন বাদ দিয়ে শনিবার গেলে কেমন হয়?'

'আমার কোনো আপত্তি নেই।' ঘাড় নেড়ে বললেন সৃজনকাকা।

খাওয়াদাওয়া সেরে শনিবার দুপুর বারোটায় আমরা রওনা হলাম রানীবাঁধের দিকে। দু'খানা জিপে প্রায় জনা আটেক মানুষ। আমরা চারজন ছাড়া দুজন ড্রাইভার, দুজন পুলিশের কনস্টেবল।

বাঁকুড়া থেকে রানীবাঁধের রাস্তাটা খুব সুন্দর। কালো পিচে বাঁধানো। রাস্তার দু'পাশে কোথাও রুক্ষ ঢেউ খেলানো প্রান্তর, ছোট নিচু পাহাড়, কোথাও বা সবুজ ক্ষেত, গ্রাম।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা রানীবাঁধ পৌঁছে গেলাম। কুসুমডিহি গ্রামটা রানীবাঁধ থেকে প্রায় তিন-চার কিলোমিটার ভেতরে। একটা শাল জংগলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। জিপে চড়ে সেখানে পৌঁছতে মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশি লাগল না। গ্রামটার চারপাশে প্রচুর গাছপালা। শাল, কুসুম, গামার আর নিম গাছ। জায়গাটা খুব নির্জন। জিপ দেখে দু'চারজন মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

মিঃ সমাদ্দার বললেন, 'তোমাদের গ্রামের অন্য মানুষজন গেল কোথায়?'

ওদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তসমর্থ মানুষটি, নাম শ্রীদাম, জবাব দিল, 'বাঘের অত্যাচারে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালায়েছে স্যার। আমরা এই দু'তিন ঘর কেবল আছি এখনো।'

সৃজনকাকা আশেপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা পালাননি কেন?'

'যাবার জায়গা নেই, তাই পড়ে আছি। কিন্তু আর বেশিদিন থাকতে পারব না। বাঘের অত্যাচার যা বেড়েছে–'

'কেন আপনাদের কেউ কি মারা পড়েছে বাঘের হাতে?'

'না, তা পড়েনি এখনো। তবে পড়তে কতক্ষণ! তাছাড়া ঘরের চালে রাতের বেলা ঢিল পড়ে, সারা রাত বাঘের হালুম হুলুম। সেদিন একটা ছেলে হাট থেকে ফিরতেছিল, এমন সময় বাঘটা ওর ওপর ঝাঁপায়ে পড়ল! অবশ্য ছেলেটার কিছু হয় নাই, কোনোরকমে ছুটে পালায়েছে–'

'এখানে আছে ছেলেটা? ওকে ডাকুন তো।'

'ও কি আর এই গাঁয়ে আছে স্যার! পরের দিনই ওরা সবাই তল্পিতল্পা গুটায়ে খাতরায় মামাবাড়ি চলে গেছে।'

'স্ট্রেঞ্জ! বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল, অথচ ছেলেটার কিছুই হলো না। কেবল একটু ভয় পাওয়া ছাড়া–'

'ব্যাপারটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো।' মিঃ সমাদ্দার বললেন।

'তাছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে শিকারী রিপোর্ট দিয়েছেন এখানে বাঘ নেই। এই দু'টো ব্যাপার থেকে মনে হয়, কেউ নিশ্চয়ই বাঘের একটা বাতাবরণ তৈরি করে কোনো কাজ হাঁসিল করতে চাইছে। গাঁয়ের লোকজনদের হটাতে চাইছে। কী রে অমল, তোর কী মনে হয়?'

'হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। তবে একটা ব্যাপারে খানিকটা খটকা আছে, এদের মধ্যে অনেকেই নাকি জলজ্যান্ত বাঘটাকে দেখেছে।'

'গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন সৃজনকাকা, 'হ্যাঁ সেই ব্যাপারটাই তো আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।'

শ্রীদামের দিকে সৃজনকাকা ফিরলেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে বাঘটাকে দেখেছে?'

'আমিই তো দেখেছি স্যার।'

'তাই নাকি! যাক ভালোই হলো। আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন তো বাঘটাকে কোথায় দেখলেন, কী দেখলেন, কীভাবে দেখলেন!'

'দিন দশেক আগে কুটুমবাড়ি থেকে ফিরতেছিলাম। একটু রাত হয়ে গেছিল। তা প্রায় আটটা-ন'টা হবে। রানীবাঁধ হয়ে কুসুমডিহি যাবার জন্য জংগলের ভেতরে ঢুকেছি, এমন সময় ঝোপের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল একটা বিরাট বাঘ। জংগলের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়া চেহারা। নীল দু'টা চোখ। সেই দৃশ্য দেখে বাবা-গো মা-গো বলে জংগলের রাস্তা ছেড়ে গরুর গাড়ির রাস্তা দিয়ে ছুটে পৌঁছালাম গ্রামে।'

'বাঘটা কি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল, নাকি আপনাকে তাড়া করেছিল?'

'না, বাঘটা আমাকে তাড়া করেনি। যতদূর মনে পড়ে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল।'

'আচ্ছা, যেখানে বাঘটাকে দেখেছিলেন, সেই জায়গাটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

এরপর আমরা সবাই জিপে চড়ে শ্রীদামের নির্দেশমতো জংগলের মধ্যে একটা জায়গায় এলাম। জংগলের মধ্যে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রীদাম বলল, 'এই এখানটায় দাঁড়িয়ে বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিলাম।'

শ্রীদাম যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে সৃজনকাকা সোজা সামনের দিকে তাকালেন। ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, শাল জংগলের মাঝে খানিকটা খোলা

জায়গা। তারই মধ্যে বড় একটা পাথরের চাঁই।

'সৃজনকাকা বললেন, 'শ্রীদামবাবু, আপনি এখান থেকে কতদূরে বাঘটাকে দেখেছেন?'

'তা প্রায় একশো গজ দূরে।'

'একশো গজ দূরে তো ওই পাথরের চাঁইটা রয়েছে। ওর সামনে না পেছনে?'

'মনে হচ্ছে, ওই পাথরের চাঁইটার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল বাঘটা।'

'কিন্তু অত খাড়া পাথরের চাঁইয়ের ওপর বাঘটা দাঁড়িয়েছিল কীভাবে?'

'তাহলে হয়তো পাথরটার সামনেই ছিল বাঘটা।'

'বাঘটা কীরকম দেখতে ছিল মনে আছে? মানে গায়ের রঙ কেমন? কতটা উঁচু?'

'গায়ের রঙ ঠিক বুঝতে পারি নাই। তখন চারিদিকে অন্ধকার। আর বাঘটা বোধহয় পাথরটার সমান উঁচু ছিল।'

'বলেন কি, বিরাট বাঘ তাহলে!'

সৃজনকাকা আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেন পাথরের চাঁইটার কাছে। পকেট থেকে একটা লেনস্ বের করে পাথরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

'মিঃ সমাদ্দার একটু হালকা গলায় বলেন, 'মিঃ বোস, আপনি কি বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজছেন নাকি?'

'বাঘের পায়ের ছাপ যে নেই, সেটা তো আপনি আর সেই শিকারী দেখে গেছেন। তাছাড়া বাঘ যেখানে নেই, সেখানে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজব কেন?'

'তবে কী খুঁজছেন?'

'সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবেন–' বলতে বলতে সৃজনকাকার ধাক্কায় বিরাট পাথরের চাঁইটা একটু যেন নড়ে উঠল।

সৃজনকাকা বললেন, 'আপনারা সবাই হাত লাগিয়ে পাথরটাকে ঠেলুন তো। আমি একলা পারছি না।'

কাকার কথায় আমরা সবাই মিলে পাথরটাকে একটু ঠেলতেই পাথরটা সরে গেল একপাশে। আর সেই জায়গায় দেখা গেল একটা বড়সড় গর্ত। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে।

আতঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন অমল সামন্ত, 'এ যে মনে হচ্ছে ডাকাতের আস্তানা!'

'তবে ঢুকে লাভ নেই। কারণ ডাকাতদের কাউকেই এখন পাওয়া যাবে না', সৃজনকাকার গলা গম্ভীর।

মিঃ সমাদ্দার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তবে কি আস্তানা খুঁজে পেয়েও ডাকাতদের ছেড়ে দেবো?'

'না, ডাকাতদের ছেড়ে দিতে বলিনি। তবে এখন আস্তানায় গেড়ে বসে থাকলে ডাকাতরা ভুলেও এদিকে রাস্তা মাড়াবে না। এখন বরং কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করা যাক। সন্ধ্যেবেলা আবার এখানে আসা যাবে। ততক্ষণ এই দু'জন কনস্টেবল দূর থেকে নজর রাখুক। তবে আরো কয়েকজন পুলিশ হলে ভালো হতো।'

'সেজন্য চিন্তা নেই। সঙ্গে ওয়্যারলেস আছে। তাতে খবর পাঠালে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ফোর্স এসে যাবে।'

'মনে হয়, আমরা সবাই জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছি, এমন একটা লোক-দেখানো ব্যাপার করা যেতে পারে। বাঁকুড়ায় আরেকটা খবর পাঠান, আমার জন্য স্থানীয় কলেজ থেকে একটা আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প যেন নিয়ে আসে।'

'আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প! সেটা দিয়ে কী করবেন?'

সৃজনকাকা হেসে বললেন, 'এখন বলতে পারব না। সবকিছুই ক্রমশ প্রকাশিতব্য।'

গ্রামের মানুষজন গ্রামে ফিরে গেল। তাদের বলা হলো, এসব কথা যেন কাউকে না বলে। তাছাড়া আজকের সন্ধেবেলাটাও যেন ঘরে বসেই কাটিয়ে দেয়। কনস্টেবল দু'জন দূরে গাছের ওপর উঠে বসে রইল। ডাকাতদলের লোকজনদের দেখতে পেলে ওয়াকিটকিতে খবর পাঠাবে।

আমি বললাম, 'কিন্তু এতক্ষণ কোথায় কাটাব আমরা?'

অমল সামন্ত বললেন, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। রানীবাঁধে ফরেস্ট রেঞ্জারের একটা অফিস আছে। ওখানেই আমরা দু'তিন ঘন্টা বিশ্রাম নিতে পারব।'

ফরেস্ট রেঞ্জার কালীবাবু খুবই অমায়িক ভদ্রলোক। আমাদের জন্য গেস্টরুমটা খুলে দিলেন। চা জলখাবার মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িতও করলেন। গল্প করতে করতে বিকেল।

সৃজনকাকা বললেন, 'আচ্ছা কালীবাবু, আপনি তো এখানে অনেকদিন আছেন। রানীবাঁধের পাশের জঙ্গল থেকে বাঘের আওয়াজ শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

'আমি নিজে ঠিক শুনিনি। তবে লোকের মুখে শুনেছি, কুসুমডিহি গ্রামের কাছে নাকি বাঘের আওয়াজ শোনা যায়। এটা নিয়ে কিছু খোঁজখবরও করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেছে।'

হঠাৎ সৃজনকাকার নজরে পড়ল ঘরের কোণে রাখা একটা জিনিসের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে বললেন উনি, 'আরে এখানে দেখছি আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প। এটা দিয়ে আপনি কী করেন কালীবাবু?'

'আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প! ওটা তো ফরেস্টের জিনিস নয়। আমারও নয়। তবে বোধহয় ভুচুনলালের।'

'ভুচুনলাল? সে আবার কে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন অমল সামন্ত।

'ভুচুনলাল আমার অফিসের নতুন চৌকিদার। দু'তিন মাস হলো কাজে ঢুকেছে।'

'লোকটাকে একটু ডাকুন তো কালীবাবু।'

কিন্তু সারা চত্বর খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না ভুচুনলালকে। কালীবাবু বললেন, 'আধ ঘন্টা আগে তো এখানেই ছিল। তবে বোধহয় কোনো কাজে গেছে।'

'বুঝতে পেরেছি, বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারার লোকটা তো! ওকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'তোমার কি মনে হয় ওই ভূচুনলাল ডাকাতদলের একজন ?' ফিসফিস স্বরে সৃজনকাকাকে জিজ্ঞেস করি আমি।

'হলে অবাক হবো না–', বলতে বলতে কাকা ঘরের কোণ থেকে আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা তুলে নেন হাতে। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, 'মিঃ সমাদ্দার তাড়াতাড়ি চলুন। ওই ভূচুনলালকে ধরতে হবে।'

'কোথায় ?'

'ওই জংগলের মধ্যে ডাকাতের আস্তানায়, যেখানে আমরা সুড়ংগ দেখেছি।'

'কিন্তু ও ওখানে যাবে কেন ?' কালীবাবু প্রশ্ন করেন।

'একবার অন্তত যেতে হবে। নিজেদের মালপত্র সরাবার জন্য।'

জিপে গিয়ে বসতেই জিপের ওয়ারলেসে আওয়াজ উঠল। গাছের ওপর থেকে কনস্টেবল দু'জন সিগন্যাল দিচ্ছে। অর্থাৎ পাথরের চাঁইয়ের কাছে ডাকাতদল আবার জড়ো হয়েছে।

জিপ ছেড়ে দিল। আমাদের সংগে কালীবাবুও চলেছেন। মিঃ সমাদ্দারের সংগে রয়েছে নিজের রিভলভারখানা। আমাদের জিপ দুটো থামল পাথরের চাঁই থেকে খানিকটা দূরে। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে তখন।

জিপ থেকে নেমে আমরা এগোলাম পাথরের চাঁইটার দিকে। খুব ধীরে ধীরে, সাবধানে, যাতে ঝট করে কেউ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। সৃজনকাকার হাতে ফরেস্ট রেঞ্জারের বাড়ি থেকে পাওয়া আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পখানা। হঠাৎ সৃজনকাকা লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলেন পাথরের চাঁইটার কাছে। আমরা সবাই তখন অনেক পেছনে।

কাকার হাতের আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। সংগে সংগে দূরে কোথা থেকে যেন বাঘ ডেকে উঠল, 'হালুম–'

আমরা সবাই চমকে উঠে দেখলাম, পাথরের চাঁইয়ের ওপরে একটা বাঘ দাঁড়িয়ে। নীল চোখ দু'টো জ্বলছে। না, ভুল বললাম, পাথরের চাঁইয়ের ওপরে বাঘটা দাঁড়িয়ে নেই। আসলে পাথরের চাঁইটাই একটা বাঘের চেহারা নিয়েছে।

সৃজনকাকা হাতের আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, ভোজবাজির মতো বাঘ অদৃশ্য। আমাদের সামনে পাথরের চাঁইটা পড়ে আছে। কাকা আবার আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলেন। আবার সেই বাঘটা হাজির। সংগে সেই হালুম শব্দ। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম, এই পাথরের চাঁইয়ের সংগে বাঘের চেহারার কী অদ্ভুত মিল।

হাতের ল্যাম্পটা আবার নিভিয়ে দিলেন সৃজনকাকা। চারিদিকে আবার অন্ধকার। সংগে সংগে অমল সামন্তর পাঁচসেলী টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে আমার নজরে পড়ল, পাথরের চাঁইয়ের পেছনে দু'তিনটে লোক। গর্তের ভেতর থেকে কী যেন টেনে তুলছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ডাকাত, ডাকাত–'। সংগে সংগে কনস্টেবল দু'জন ছুটল। আমরাও ছুটলাম। আমার চিৎকার শুনে ওই লোকগুলো আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপরই ছুটতে শুরু করল।

মিঃ সমাদ্দার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দাঁড়াও, নাহলে কিন্তু গুলি করব–'

কিন্তু লোকগুলো থামল না। টর্চের আলোতেই মিঃ সমাদ্দার গুলি করলেন। ভদ্রলোকের হাতের টিপ দারুণ। যে লোকটার হাতে ব্যাগটা ছিল, সে পড়ে গেল মাটিতে। একজন সংগী মাটিতে পড়ে যেতেই বাকি দু'জন থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে দু'জন কনস্টেবল ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। আমরাও পৌঁছে গেছি ততক্ষণে। দেখলাম, মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটা আর কেউ নয়, ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিসের ভূচুনলাল।

পেছন থেকে আর একটা গাড়ির হর্ন পাওয়া গেল। ফিরে দেখি, বাঁকুড়া থেকে আরেকখানা জিপ হাজির। তা থেকে নামলেন ডি এস পি মিঃ নাগ ও আরো চারজন কনস্টেবল। ওরাই ডাকাতদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ নাগ বললেন, 'সৃজনবাবুর আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প পাওয়া গেল না। কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'আর দরকার নেই। এখানেই পেয়ে গেছি।'

মিঃ সমাদ্দার ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ভূচুনলালের হাত থেকে থলেটা ছিনিয়ে নিয়েছেন। তা থেকে বেরোলো হেরোইনের প্যাকেট।

অমল সামন্ত গর্জে উঠলেন, 'তাহলে ভূচুনলাল, এই তোমার কাজ! কে তোমাদের লিডার ?'

আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে জবাব দিল ভূচুনলাল, 'কালীবাবু–'

তাকিয়ে দেখলাম, কালীবাবু সরে পড়বার চেষ্টা করছেন। তা আর হলো না। তার আগেই ওঁকে ঘিরে ধরলো পুলিশের দল।

মিঃ সমাদ্দার বললেন, 'এতক্ষণে বোঝা গেল, কোন জায়গা থেকে রাঁচি, ধানবাদ, টাটানগর আর বোকারোয় হেরোইন পাচার হচ্ছিল। হেরোইন আর বাঘ–তাহলে একই রহস্যের এপিঠ আর ওপিঠ।

সৃজনকাকা বললেন, 'এটাই সব নয়। গর্তের ভেতরে নিশ্চয়ই আরো হেরোইন আছে। ওখানে সার্চ করে দেখবেন না!'

কালীবাবু আর ভূচুনলাল ওপরে রইল পুলিশের হেফাজতে। বাকি দু'জনকে হাতকড়া পরা অবস্থাতেই নিয়ে আমরা নিচে নামলাম সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ি শেষ হলে মাটির নিচে একটা ঘর। ইঁট সিমেন্টের তৈরি ঘর। দেয়ালে সাদা চুনকাম। ঘরটা মোটামুটি বড়। আন্দাজ ষোলো ফিট বাই কুড়ি ফিট। ঘরে গ্যাসের আলো জ্বলছে। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। দু'তিনটে বড় কাঠের

বাক্স। একটা কাঠের বাক্সে অজস্র প্লাসটিকের ব্যাগ। আর একটা বাক্স থেকে বেরোলো আরো দু'প্যাকেট হেরোইন।

সবকিছু আমি দেখছিলাম অবাক হয়ে। বাঘ ধরতে এসে ধরা পড়ল হেরোইন। এই হেরোইনের দাম কম নয়।

মিঃ নাগ বললেন, 'এই তিন প্যাকেট হেরোইনের দাম অন্তত বিশ লাখ টাকা।'

চারজনকে গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো। আপাতত থাকবে পুলিশ হাজতে।

পরের দিন সন্ধেবেলা মিঃ সমাদ্দারের সাজানো-গোছানো বাংলোয় আমাদের আড্ডা জমল আবার। সংগে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা।

সৃজনকাকার দিকে তাকিয়ে মিঃ সমাদ্দার বললেন, 'কালকের অভিযানের সাফল্যের জন্য বারো আনা কৃতিত্বই আপনার।'

লাজুক স্বরে বললেন সৃজনকাকা, 'না না, সে কী কথা। সমস্ত ব্যাপারটাই কাকতালীয় বলতে পারেন। আমরা গিয়েছিলাম বাঘ ধরতে, কিন্তু ধরা পড়ল হেরোইন। এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

'কিন্তু বাঘের ব্যাপারটা যে নকল সেটা বুঝলেন কী করে?'

'সেটা আন্দাজ আর কিছুটা ইনটুইশন। তবে এ ব্যাপারে শিকারীর রিপোর্ট আমার মনে সন্দেহটা প্রথম জাগিয়ে তুলেছিল। একজন অভিজ্ঞ শিকারীর রিপোর্ট অস্বীকার করব কী করে? তাছাড়া এই এলাকায় একটা বাঘ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কেউ মারা পড়েনি বা আহত হয়নি, এ ব্যাপারটাও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন অমল সামন্ত। এবার বললেন, 'তারপর তুই যেভাবে একটা পাথরের চাঁই থেকে বাঘ তৈরি করলি, তা এককথায় দারুণ। এরকম যে হতে পারে, তা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু এই চিন্তাটা তোর মাথায় এলো কী করে?'

'সেটা আসলে একটা ভূতাত্ত্বিক ব্যাপার। একজন ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আমি জানি, বাঁকুড়া এলাকায় টাংস্টেনের খনিজ পাওয়া যায়। টাংস্টেনের একটা খনিজের নাম শীলাইট। সেই খনিজটা আবার অন্ধকারের মধ্যে আলট্রা-ভায়োলেট আলোয় নীল রঙ হয়ে জ্বলতে শুরু করে। আর খনিজটার এই চরিত্রের জন্য ভূতাত্ত্বিকেরা শীলাইটের খোঁজে আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প নিয়ে জংগলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় রাতের অন্ধকারে। দিনের আলোয় নয়।'

'অবাক কান্ড!'

'কাল বিকেলে যখন গাঁয়ের সেই লোকটা বাঘের জায়গাটা দেখালো, তখনই আমি পাথরের চাঁইটার সংগে বাঘের চেহারার মিল পেয়ে গেলাম। লেনস্ দিয়ে পাথরটা পরীক্ষা করে মনে হলো, এর মধ্যে নির্ঘাৎ শীলাইট রয়েছে। কিন্তু সংগে আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প না থাকায় ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। পরে অবশ্য ভুচুনলালের আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা পেয়ে ধারণাটাকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারলাম। মিঃ সমাদ্দার, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, পাথরের চাঁইয়ের ওপরে আমি কিসের ছাপ খুঁজছিলাম।'

মিঃ সমাদ্দার হেসে বললেন, 'হ্যাঁ মিঃ বোস। আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল।'

'আচ্ছা কাকা, পাথরের ওপরে আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প ফেলার সংগে সংগে বাঘের হালুম আওয়াজটা হচ্ছিল কেন?'

'ওই আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা আসলে টু-ইন-ওয়ান। অর্থাৎ ওর সংগে একটা টেপ রেকর্ডারও রয়েছে। সুইচটা অন করলে আলোর সংগে আওয়াজও বেরোতে থাকে।'

'তাই নাকি! কিন্তু লোকগুলো হেরোইন পাচার করার জন্য এতসব করতে গেল কেন?'

'আসলে বাঘের ভয় দেখিয়ে মানুষজনদের ওদের আস্তানা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু বদমাইশগুলো জানত না, সায়েন্টিফিক ডিটেকটিভ সৃজন বোসের কাছে কোনো চালাকিই খাটবে না–' সশব্দে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন মিঃ সমাদ্দার।

জানো কী

□ ভূপালের তিন মহলা রাজবাড়ির এক অংশ ভেঙে পড়লো। ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে পাওয়া গেলো একটা সিন্দুক। কিন্তু সেটা খুলতেই...?

□ ম্যাম'জেল এক্স খুঁজে পেলেন হারিয়ে যাওয়া প্লেনটাকে, আহত পাইলটকেও। গোপন কাগজপত্তরের কথা তাকে বললেন–আর ঠিক তখনই...

□ চমকে উঠলেন লর্ড গ্রেস্টোক। কাপ্তেন পড়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। শুয়ে শুয়েই পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাক করলো গেব্রিয়ালের দিকে। যেই ঘোড়া টিপতে যাবে অমনি...

□ একদিকে রামগংগা আর একদিকে কোসি নদী। পেছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তুষারে ঢাকা শিবলিক পর্বতমালা। সেই বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে শিকারী নিজেকেই হারিয়ে ফেললেন। আর তারপরই...

□ খোকন মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো, মা আর কোনোদিন আমি চিঠিতে হাত দেবো না। ডাকপিয়নও হবো না! কেন খোকন কেঁদে উঠলো?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার পৌষ সংখ্যায়। সংগে আরও অনেক...অনেক..অনেক কিছু।

এসো শিখি জাগলিং // অভয় মিত্র

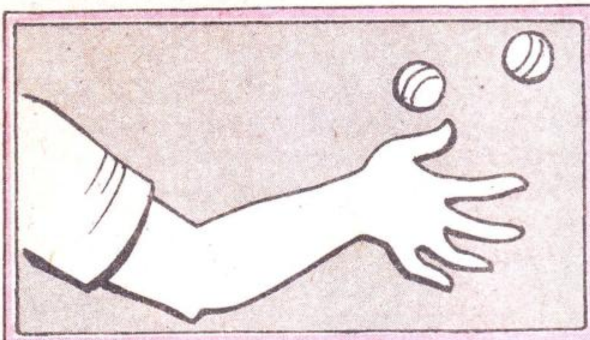

আমরা সকলেই জানি জাগলিং একটা মজার খেলা। জাগলিং খেলতে এবং দেখতে কেনা ভালোবাসে! ছোটদের তো কথাই নেই। জাগলিং কোথায় হচ্ছে, কারা করছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কি জিনিস লাগে—আরো অনেক কিছু জানার আগ্রহ আমাদের সকলেরই। সে যাই হোক, আজ আমরা জাগলিং-এর যে খেলাটা শিখব, সেটা হচ্ছে বলের খেলা। আমরা সকলেই জানি জাগলিং শিখতে হলে প্রথমেই বলের খেলা শিখতে হয়। এসো, প্রথমেই আমরা একটা একটা করে শক্ত রবারের বল ধরি। কেমন করে ধরব, ছবিতে ডান হাতের দিকে চেয়ে দেখ। কাঁধ থেকে ডান হাতটা নিচের দিকে নামিয়ে ঐ ডান হাতেরই কনুই থেকে বাহুটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তালুর ওপর শক্ত রবারের বলটি পাঁচটা আঙুল দিয়ে ভালোভাবে ধরতে হবে। যে যার নিজের ডান হাতের তালুতে বলটি ঠিকমতো ধরেছি কিনা দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক ধরা হয়েছে। এবার বলটি ওপরের দিকে দেড় ফুট উঁচুতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুঁড়ে দাও। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বলটি নিচের দিকে নেমে আসার সময় যে অবস্থায় প্রথমে ডান হাতটা ছিল সেই অবস্থাতেই রেখে নিম্নগামী বলটিকে হাতের তালুতে ধরতে হবে এবং হাতের পাঁচটি আঙুল দিয়ে এমনভাবে ধরার দরকার যাতে বলটি মাটিতে না পড়ে যায়। বলটির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাতের তালুতে পড়ামাত্রই পাঁচটি আঙুল দিয়ে বলটিকে ভালোভাবে ধরে কনুই থেকে বাহুটি একটু নিচে নামিয়ে ফেল, যাতে হাতের তালু থেকে বলটি ছিটকে আশেপাশে না পড়ে যায়। সর্বদাই মনে রাখতে হবে, চোখ বলের ওঠানামার দিকে নিবদ্ধ রাখতেই হবে। অনুশীলনের সময় অন্যদিকে মন ও চোখ যেন না যায়। আসলে জাগলিং করতে হলে মনোযোগ বা কনসেনট্রেশনের বড় বেশি দরকার। যাই হোক, বল যখন দেড় ফুট উচ্চতার অবস্থানে ওঠানামা করছে তখন বলের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও ওঠানামা করবে। এইভাবে ডান হাত দিয়ে বারবার অনুশীলন করতে হবে। বারবার অনুশীলনের ফলে যখন ব্যাপারটা পুরোপুরি রপ্ত হয়ে যাবে তখন আর বলটা হাত থেকে আশেপাশে পড়ে যাবে না। একই পদ্ধতিতে বাঁ হাতের অনুশীলন করতে হবে। আসলে জাগলিংয়ে হাত দুটোই তো আসল। তাই হাতের অনুশীলনের দিকেই সবথেকে বেশি জোর দিতে হবে।

এবার আমরা একসঙ্গে যে যার বাঁ হাতের তালুতে পাঁচ আঙুল দিয়ে বলটিকে ধরব। এবার দেড় ফুট উচ্চতার অবস্থানে ছুঁড়ে দিই। অখণ্ড মনোযোগের পাশাপাশি চোখ বলের ওঠানামার দিকে রাখতে হবে। বাঁ কাঁধ থেকে বাঁ বাহুটি সামনের দিকে রেখে কনুই থেকে একটু বেঁকিয়ে দিয়ে বলটিকে ধরে বলটি দেড় ফুট উচ্চতার অবস্থানে বারবার ছুঁড়ে দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। বারবার অনুশীলনের ফলে বলটি যখন করায়ত্ত হবে তখন ঐ দেড় ফুট উচ্চতার অবস্থানে লক্ষ্য রেখে বাঁ হাত থেকে ডান হাতে এবং ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বলটি বারবার লোফালুফি করতে হবে। তারপর ডান হাতের তালুতে একটি বল, বাঁ হাতের তালুতে একটি বল রেখে একবার ডান হাতের বলটি ওপর দিকে ছুঁড়ে এবং ঐ ডান হাতের তালুতেই লুফে নিতে হবে। তারপর বাঁ হাতের বলটি ওপর দিকে ছুঁড়ে ঐ বাঁ হাতের তালুতেই লুফে নিতে হবে। এইভাবে বারবার অনুশীলনের পর দু-হাতের তালু দিয়ে একসঙ্গে দুটি বল ঐ দেড় ফুট উচ্চতায় ছুঁড়ে দিতে হবে এবং দু-হাতের তালুতেই একসঙ্গে লুফে নিতে হবে। যখন ভালোভাবে বলটি লোফার কায়দা রপ্ত হয়ে যাবে, মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না, চোখ দু'টি বলের ওঠানামার গতির সঙ্গে ওঠানামা করবে তখন আমরা তিনটি বল দু-হাতে লোফালুফি করার জন্য অনুশীলন করব। তখন কিন্তু ডান হাতের তালুতে দু'টি বল পাশাপাশি রেখে পাঁচটি আঙুল দিয়ে ভালোভাবে ধরতে হবে এবং তিন নম্বর বলটি বাঁ হাতের তালুতে পাঁচটি আঙুল দিয়ে ভালোভাবে ধরতে হবে। তারপর প্রথমে এক নম্বর বলটি দেড় ফুট উচ্চতার অবস্থানে ছুঁড়ে দিতে হবে। যে মুহূর্তে এক নম্বর বলটি নিম্নগামী হবে, সেই মুহূর্তেই দুই নম্বর বলটি ঐ একই উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে এক নম্বর বলটি ডান হাতে লুফে নিতে হবে এবং দুই নম্বর বলটি যে মুহূর্তে নিম্নগামী হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঁ তালুর তিন নম্বর বলটি ঐ এক উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে দুই নম্বর বলটি বাম তালুতে লুফে নিতে হবে। পরক্ষণেই ডান তালুর এক নম্বর বলটি ঐ একই উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে তিন নম্বর বলটি ডান হাতের তালুতে লুফে নিতে হবে। এইভাবে বারবার একই পদ্ধতিতে এক নম্বর, দুই নম্বর এবং তিন নম্বর বল লোফালুফি করতে হবে।

হাতের তালুর মাপ অনুযায়ী বলের সাইজ হবে, যাতে পাঁচটি আঙুল দিয়ে বলটিকে ভালোভাবে ধরা যায়। বলের ওজনও এমন হবে যাতে তিনটি কি চারটি বল একসঙ্গে লোফালুফি করা কষ্টসাধ্য না হয় এবং অনায়াসে বারবার অনুশীলন করা যায়। শক্ত রবারের বল নিয়ে অনুশীলন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে বলটি হাতের তালুতে পড়ে হাতের তালু থেকে আশেপাশে ছিটকে না পড়ে।

আমরা সকলেই জানি এই ধরনের বল যে কোনো বাজারেই পাওয়া যায়। তবে তোমাদের বলব, চারটি চার রঙের বল যোগাড় করতে। চারটি বল চার রঙের হলে খেলাটি দেখাতে যেমন ভালো লাগবে তেমনি দেখতেও ভালো লাগবে। তাই না?

হারাণদা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

হারাণদাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

রবি ঠাকুর এক 'পুরাতন ভৃত্যে'র বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়–'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।' আমাদের হারাণদাকে দেখলেও তিনি একই কথা বলতেন। আমি ভূত দেখিনি, তবে ভূতের চেহারা যদি হারাণদার মতো হয় তবে সেটা মোটেই সুন্দর নয়। আর– নির্বোধ? নির্বুদ্ধিতায় গোটা দুনিয়ায় হারাণদার জুড়ি নেই। আমি তো অন্ততঃ দেখিনি।

তবে কবুল করতেই হবে হারাণদা নিরলস কর্মী, আমার অত্যন্ত অনুগত, বাধ্য। একেক সময় মনে হয় আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যই যেন হারাণদার জন্ম হয়েছিল।

একদিন কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ঘরে এসেছিল হারাণদা। আমি একটা কাজে বেরোচ্ছিলাম সে সময়। ব্যস্ত ছিলাম। তাই অন্যমনস্কভাবে বললাম, একটু বোসো হারাণদা, আসছি।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখি হারাণদা বসে আছে। ঝিমোচ্ছে।

কী হলো হারাণদা, সদর দরজা খোলা আর তুমি এখানে বসে বসে ঘুমোচ্ছ যে? আমি প্রশ্ন করলাম।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল হারাণদা। বলল একটা হাই চেপে, আপনি যে আমারে বসতি বলি গিইলেন খোকাবাবু। একগাল সরল হাসি উপহার দিল আমায়।

বাজার, দোকানের কেনাকাটা, এসব সাধারণতঃ আমিই করি। একদিন কি একটা জরুরী কাজ ছিল, তাই হারাণদাকে বললাম, যাও না হারাণদা, বাজার থেকে একটু ঘুরে এসো।

হারাণদা আদেশ পালন করতে সদা তৎপর। একটু পরেই সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজে বুঝলাম হারাণদা বেরোচ্ছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মন দিলাম।

আধঘণ্টা বাদে ফিরে এল হারাণদা।

এ কি, হারাণদা! আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, বাজারের থলেখানা কোথায় রেখে এলে?

বাজারির থইলে? হারাণদা অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে, ভাবখানা যেন বাজারের থলে নামক অদ্ভুত বস্তুটি জীবনে কোনোদিন চাক্ষুষ করেনি। আপনি তো আমারি বাজারি ঘুরি আসতি বলিছেন। বাজার করতি তো বলেননি।

সত্যিই তো, দোষ আমারই। হারাণদাকে যা বলব, যেটুকু বলব হারাণদা তা-ই এবং সেটুকুই করবে, এ কথাটা আমার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

মনে মনে রাগ হলো, হাসিও পেল। বললাম, নাঃ, তোমাকে দিয়ে হবে না। দাও, থলেটা দাও। আমিই বাজার করে নিয়ে আসছি।

বেরোবার মুখে বললাম হারাণদাকে, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরব। আমার এক বন্ধুর বাবা আসতে পারেন। তিনি এলে দাঁড় করিয়ে রেখো, দেখো যেন চলে না যান।

ঘাড় কাত করে বলল হারাণদা, আচ্ছা, খোকাবাবু।

বাজার থেকে ফিরে এলাম ঘণ্টাখানেক পর।

ঘরে ঢুকেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। থমকে দাঁড়ালাম, আর বাজারের থলেটা আস্তে আস্তে আমার হাত থেকে খসে নিচে পড়ে গেল।

দেখলাম, লাঠি হাতে বসে আছে হারাণচন্দ্র, আর তার সামনে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বন্ধুর বৃদ্ধ পিতা।

কয়েক সেকেন্ডে বিস্ময়ের আঘাত সামলে দিয়ে বললাম, কী হলো হারাণদা, তোমার হাতে লাঠি কেন? মেসোমশাই, আপনি বসুন।

না বাবা, ঢের হয়েছে। ক্ষুব্ধ মেসোমশাই থমথমে কণ্ঠে বললেন, আর বসার সাধ নেই, এবার চলি।

দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

লাফিয়ে উঠল হারাণদা। মেঝেতে লাঠি ঠুকে বলল, যাবেন মানে? খোকাবাবু, আপনারি বসতি বলিছেন।

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। ভয়ার্ত নজরে হারাণদার দিকে তাকালেন।

কই, বসুন! হুঙ্কার ধ্বনিত হলো।

বৃদ্ধ মেসোমশাই গুটিগুটি এসে চেয়ারে বসে পড়লেন বিনা

বাক্যব্যয়ে।

হারাণদার আচরণ রীতিমতো রহস্যজনক! বুঝতে পারলাম আমার অনুপস্থিতিতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যা বৃদ্ধ মেসোমশায়ের দুর্বল স্নায়ুকে দুর্বলতর করে দিয়েছে। তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

তোমার হাতে লাঠি কেন, হারাণদা? আর মেসোমশায়ের সঙ্গে অমন করে কথাই বা বলছ কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

উদ্যত লাঠিখানা নামিয়ে রুষ্ট কণ্ঠে বলল হারাণদা, লাঠি কি আর সাধ করে হাতে নিইছি খোকাবাবু? আপনি বলি গিইলেন আপনার বন্ধুর বাবা আলি তারে দাঁড় করায়ে রাখতি। বলেননি?

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

তা এই বুড়ো কি কতা শোনে? যতবার বলি আপনারে দাঁড়ায়ি থাকতি বলিছেন খোকাবাবু ততবারই উনি চোখ গরম করি বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝিছি আর চেয়ারি বসতি যান। আমি তখন আর কি করি? লাঠিখান্ এনিছি, বলিছি দাঁড়ায়ি না থাকলি লাঠির বাড়িতি মাথা ভাঙব।'

হারাণদার কথা শুনে পরিস্থিতিটা আন্দাজ করে আমার হাসি চেপে রাখা দায় হলো। ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি!

এমনি করে আর কাঁহাতক পারা যায় হারাণদাকে নিয়ে? ওকে কলকাতা নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে আমার।

হারাণদা আমাদের বহু পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী। গ্রামের বাড়িতে থাকত। আমাদের বাড়িতেই খেয়ে-পরে মানুষ। কলকাতায় ফিরবার সময় মা ওকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একা একা থাকিস, খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয় না। হারাণ যাক তোর সঙ্গে। রান্নাবান্না আর ঘরের কাজকর্ম ও-ই করতে পারবে।

আমি প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলাম। মা শোনেননি।

গাঁয়ের বাড়ি থেকে রেল স্টেশনে আসতে হয় বাসে করে। আমি তো হারাণদাকে নিয়ে বাসে উঠলাম, আর বাস ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনিতে টাল সামলাতে না পেরে হারাণদা বাসের মধ্যে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল।

খোকাবাবু, আমারি ফেলি দেলে! করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হলো হারাণদার কণ্ঠে।

হারাণদাকে তুলে বসিয়ে দিলাম সীটে। কিছুক্ষণ পর বাসটা ব্রেক কষতেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

আবার তুলে বসালাম তাকে। মৃদু ভর্ৎসনা করে বললাম, বলেছিলাম না, কিছু একটা ধরে বসে থাকতে? বাসে এমন ঝাঁকুনি লাগেই।

বসিছেলাম তো, শক্ত করিই ধরি বসিছেলাম, হারাণদা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল তার কোলের ওপর রাখা জামাকাপড়ের পুঁটলিটাকে দেখিয়ে, ইডারি দুই হাতি ধরি বসিছেলাম।

বাস থেকে নেমে ট্রেনে চড়লাম। হারাণদার হাতে টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বললাম, সাবধানে রেখো হারাণদা, এটা আমার টিকিট। দেখো, হারায় না যেন।

ট্রেনে বাসের মতো ঝাঁকুনি নেই, অতএব ভ্রমণ করতে মন্দ লাগেনি হারাণদার। বেশ খুশি-খুশি মেজাজেই ছিল সারাক্ষণ। আরাম করে জানালার কাছে বসে অবাক হয়ে বাইরের নানা দৃশ্য দেখছিল সে।

আমি পাশে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমাকে ঠেলা মেরে বলল হারাণদা, খোকাবাবু, দেখেন, ইদিকে তাকায়ে দেখেন। ঘরবাড়ি, গাছপালাগুলান কিরাম্ ছুটতিছে। মনে হয় টেরেনডারি দেখি ভয় পেইয়েছে।

আশেপাশের যাত্রীরা মুখ টিপে হাসলেন ওর কথা শুনে। আমি বুঝিয়ে বললাম, না হারাণদা, ট্রেনটা ছুটছে বলে ওরকম মনে হচ্ছে। ঘরবাড়ি, গাছপালা সব যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়েচড়েনি। আমরাই কেবল এগিয়ে চলেছি কলকাতার দিকে।

গোল বাধল শেয়ালদা স্টেশনে নেমে।

হারাণদা ঠিক আমার পেছনে পেছনেই আসছিল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, খোকাবাবু!

ঘুরে দাঁড়ালাম। একজন টিকিটবাবু তখন হারাণদার একটা হাত ধরে বলেছেন, টিকিট কই? টিকিট দাও।

আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে মনে বল পেল হারাণদা। রুখে দাঁড়িয়ে বলল টিকিটবাবুকে, আমার টিকিট তোমারি দেব কেন? এডা আমার টিকিট, পয়সা দিয়ে কিনিছি। তোমার দরকার হলি একটা টিকিট কিনি নাও।

টিকিটবাবু বেশ পুলকিত হলেন হারাণদার কথা শুনে।

আমি বললাম, ওই টিকিটটা আর তোমার কোনো কাজে লাগবে না, হারাণদা। ওটা বরং দিয়ে দাও টিকিটবাবুকে। আমরা বাসে উঠে আবার টিকিট কিনব'খন।

পয়সাডার কি হবে? ওরে কি এমনি এমনি দিয়ে দেব?

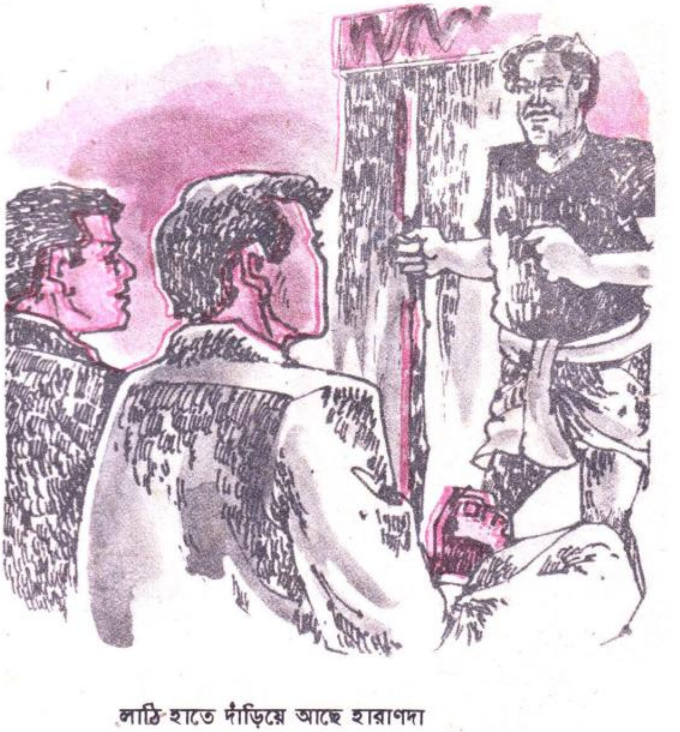

লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হারাণদা

ও টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, সুতরাং ওর আর কোনো দাম নেই এখন। দিয়ে দাও।

এরকম সহজ, সরল একজন গেঁয়ো মানুষ যে কলকাতা শহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রার সঙ্গে কোনোদিনই খাপ খাওয়াতে পারবে না তা বুঝতে পেরেছিলাম। অন্য কেউ হলে দু'দিনেই দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত, কিন্তু হারাণদা আমার কাছে একবারও এ নিয়ে কিছু বলেনি মুখ ফুটে। আমার প্রতি তার প্রাণের টান ছিল।

মুশকিল হলো আমার। কি করে বলি, হারাণদা, তোমার মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু নেই, তোমার গেঁয়ো কথাবার্তা এ শহরে অচল, তুমি বরং দেশেই ফিরে যাও?

যাই হোক, বন্ধুর বাবাকে তো সেদিন অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে শান্ত করলাম। হারাণদাকে দিয়ে ক্ষমাও চাওয়ালাম।

তিনি চলে যাবার পর বললাম হারাণদাকে, কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে এরকম আচরণ করতে নেই। বাড়িতে কেউ এলে বসাতে হয়।

ভদ্দরলোক? হারাণদা ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বলল, কই, আপনি তো কোনো ভদ্দরলোকের কথা বলেননি খোকাবাবু।

সে কি, বন্ধুর বাবা আসবেন, বলিনি?

উনি তো বুড়ো। বুড়ো মানুষ আবার ভদ্দরলোক হয় নাকি?

কেন, বুড়ো মানুষরা কি ভদ্রলোক হতে পারে না? মনে মনে পুলকিত হয়ে বললাম আমি, আচার-আচরণ ভালো হলেই, কথাবার্তা মার্জিত হলেই ভদ্রলোক হওয়া যায়।

তালি উনি আমারি চোখ রাঙায়ি ধমক দিতি গেলেন কেন?

ওটাই ওঁর অভ্যাস হয়তো। বড়লোক মানুষ তো।

আমার কথা শুনে হেসে বলল হারাণদা, ইডা আবার কি কতা বললেন খোকাবাবু। ওই বুড়ো তো একদম ছোট। ছোট লোকডারি আপনি বড় লোক বানায়ি দিলেন?

ছোটলোক? তুমি ওঁকে ছোটলোক বলছ? জানো, ওঁর ব্যাংকে কত টাকা আছে? ভদ্রলোক কলকাতা শহরে একটা পাঁচতলা বাড়ির মালিক?

বিজ্ঞের মতো বলল হারাণদা, টাকা থাকলি আর পাঁচতলা বাড়ির মালিক হলিই বড় লোক হওয়া যায়? নিজের কাঁধে আঙুল ঠেকিয়ে বলল হারাণদা, সোজা দাঁড়ালি বড়জোর আমার এই কাঁধ পর্যন্ত হবে। এরি আপনি বড় লোক বলেন কি কইরে? তালি আমি তো দইত্যি।

এবার হেসে ফেললাম হারাণদার কথা শুনে। উচ্চতাই হলো হারাণদার মাপকাঠি। অর্থের প্রাচুর্য যে একজন মানুষকে বড়লোক করে তা তার ধারণার বাইরে।

এর দিনকয়েক পরের কথা।

আমার তিন বন্ধুর আসবার কথা ছিল। হঠাৎ একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরোতে হলো। বেরোবার আগে বললাম, হারাণদা, আমার তিনজন বন্ধু আসবে। তাঁরা এলে বসিয়ে রেখো।

আচ্ছা খোকাবাবু। ঘাড় হেলিয়ে বলল হারাণদা।

দাঁড় করিয়ে রেখো না যেন।

আচ্ছা।

ফিরে এসে দেখি এবারও আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে হারাণদা। আমার তিন বন্ধু ডিসপেপসিয়ার রোগীর মতো মুখ বাঁকিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছে সদর দরজার বাইরে, সিঁড়ির ওপর।

পেছনে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হারাণদা, দরজা আগলে।

বন্ধুরা, বলা বাহুল্য, আর বাড়ির ভেতর ঢুকল না। আমাকে রীতিমত গালাগালি দিল তারা যাচ্ছেতাই করে, তারপর দলবেঁধে চলে গেল। তাদের শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে হতে আমার মেজাজের টেম্পারেচার বেড়ে উঠছিল চড়চড় করে। তারা বিদায় হতেই ক্রোধে ফেটে পড়লাম, হারাণদা! এটা কী করলে তুমি? কি হলো এটা?

হারাণদা নির্বিকার। কুন্‌ডা কী হইল? সে পালটা প্রশ্ন করল।

আমার বন্ধুদের তুমি বাইরে বসিয়ে রেখেছিলে কেন?

আপনার বন্ধু কিডা, খোকাবাবু? বিস্ময় প্রকাশ করে বলল হারাণদা, কই, তারা তো তা বলেননি!

কেন, আমি তো বলেই গিয়েছিলাম।

সে তো বলি গিইলেন। কিন্তু কিডা আপনার বন্ধু তা আমি চেনব কি কইরে? ওনারা তো কেউ স্বীকারে যাননি।

তার মানে?

আমি ওনাদের জিজ্ঞাস করিছেলাম, আপনারা কি খোকাবাবুর বন্ধু? তা ওনারা বইললেন, না। তালি আমি কি কইরে বোঝবো?

বুঝলাম বন্ধুরাই এজন্য অনেকটা দায়ী। হারাণদাকে বোকা পেয়ে ওরা ওর সঙ্গে একটু মজা করতে চেয়েছিল।

যাই হোক, বললাম আমি, ওদের ভেতরে এনে বসাতে পারতে।

কি কইরে বসাই? আপনিই তো অচেনা লোকরি ঘরের মধ্যি ঢোকাতি বারণ করিছেন।

অকাট্য যুক্তি! আমার অস্ত্রে আমাকেই মোক্ষম আঘাত!

বলার আর বিশেষ কিছু ছিল না তবু আমতা আমতা করে বললাম, হ্যাঁ, তা বেশ। তো তাদের বাইরের সিঁড়ির ওপর বসিয়ে রাখবার মানেটা কী?

আপনি বলিছেলেন না?

আবার আঘাত!

কী বলেছিলাম আমি? বাইরে বসিয়ে রাখতে?

আপনি বলিছেলেন ভদ্দরলোক কেউ আলি বসায়ি রাখতি! তাই আমি সিঁড়িতি বসায়ে রেখিছেলাম। বসতি কি চায়? লাঠিডারি এনি তবেই...

হারাণদার প্রভুভক্তি আরো পরখ করবার সাহস আর আমার ছিল না। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম এভাবে আর কিছুদিন চললে আমার বন্ধু ও স্বজন বিচ্ছেদ অনিবার্যভাবে ঘটবে। শেষ পর্যন্ত ভক্তির গুঁতোয় আমাকেই কলকাতা শহর ছেড়ে পালাতে হবে।

সুতরাং পরদিন ভোরের গাড়িতেই হারাণদাকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরতে হলো আমায়।

ছবি : গৌতম

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

চটপট লক্ষ্মীছেলের মতো গাড়িতে ওঠো। নইলে দেখছ এই ছুরি ?
!
গরর ! ভোঃ !
ছুরি দেখিয়ে লাভ হবে না স্যাঙ্গাৎ...
!
গরর ! ভোঃ !
ভোক্ ! ভোক্ !
ভালো চাও তো গাড়িতে উঠে পালাও...
আমার কথা না শুনলে তোমাদের লাশ এখানেই পড়ে থাকবে, বুঝেছ স্যাঙ্গাৎ ?... একটা ছুরি নিয়ে ক'টা কুকুর সামলাবে তুমি ?
হেঈঈ-ঈ ! তুই গাড়িতে বসে মজা দেখছিস নাকি ? ঝটপট পিস্তলটা বার করে নেমে আয়।
গরর ! ভৌ ভোঃ !
মাথা খারাপ ! পিস্তল চালিয়ে মরব ? বাঁচতে চাস তো ছোঁড়াটাকে ছেড়ে গাড়িতে ওঠ্ — তার আগে তোর পিছনদিকে একবার চেয়ে দ্যাখ্।

(চলবে)

Registration No. W. B./E.C.—60 November '90 Suktar.

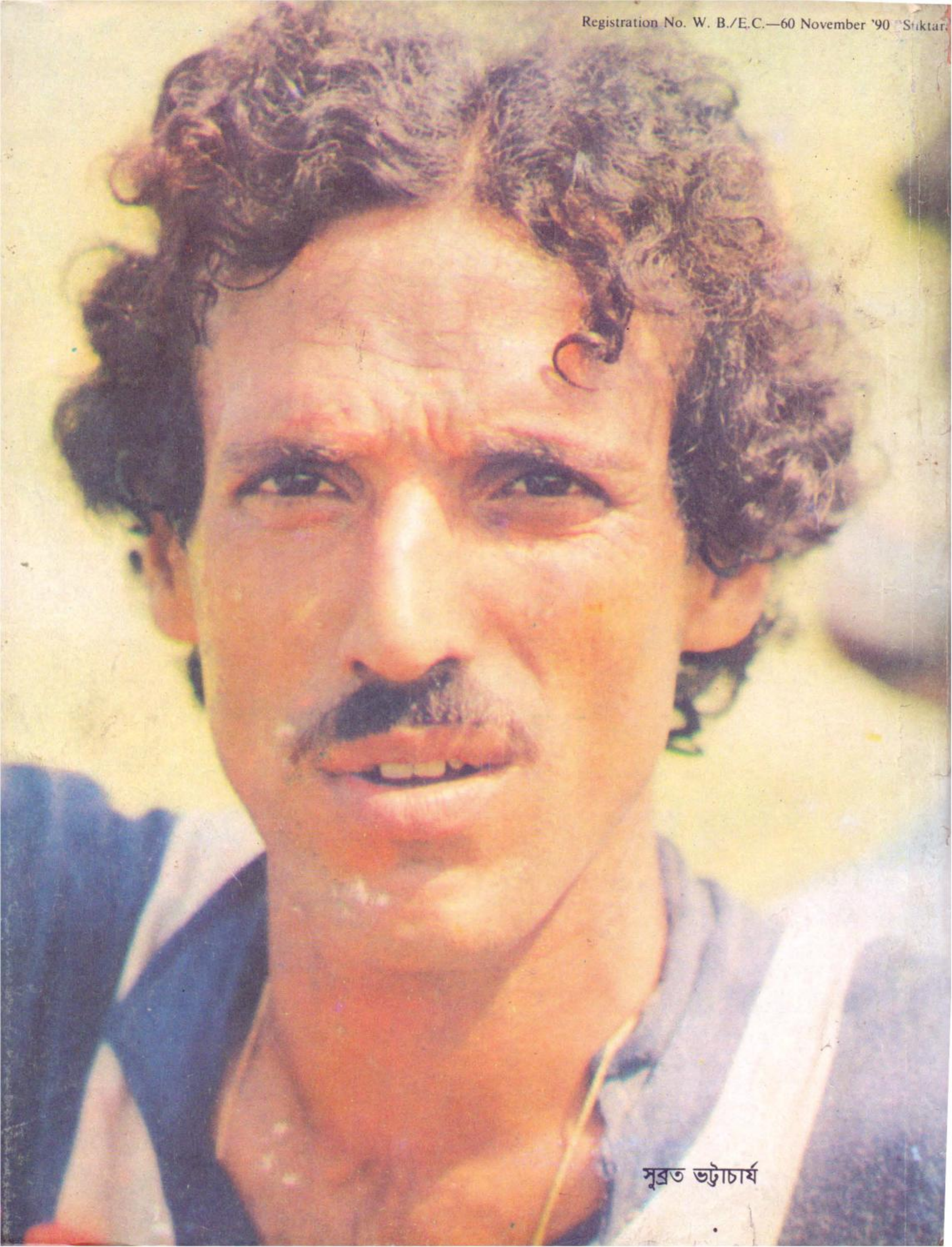

সুব্রত ভট্টাচার্য